Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কী এবং কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার ময়না

রোলঃ 227020745

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কী এবং কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা আক্তার ময়না

রোলঃ 227020745

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মার পবিত্রতা কী এবং কেন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা আক্তার ময়না, আইডিঃ 227020745 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার পবিত্রতা কী এবং কেন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আরিফা আক্তার ময়না

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আরিফা আক্তার ময়না

আইডিঃ 227020745

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর তায়ালার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের রব। আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে যিনি আমাকে আলিম প্রিপারেটরি কোর্সের অংশ হিসেবে থিসিস সম্পুর্ণ করার মাধ্যমে আলিম কোর্স সম্পুর্ণ করার তাওফিক দিয়েছেন।আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধেয় আরমান হোসাইন উস্তাযের প্রতি থিসিস সম্পুর্ণ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশণা প্রদান করার জন্য। আরও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার সম্মানিত উস্তাযগণকে যারা আমাদের মত সাধারণ মানুষেদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদের প্রতি যারা IOM এর খেদমতে বিভিন্ন ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আমার ব্যাচের সি আর, মুকররিরাহ সহ সকল আপু যারা আমাকে এই কোর্সে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে সাহায্য করেছেন বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার থিসিসের কাজে যারা বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন তাদেরকে।

সংক্ষিপ্তসার

মানুষ হচ্ছে ভেতর এবং বাহির তথা দেহ ও আত্মার সমষ্টির নাম। হাদীসবেত্তাগণ বলেন যে, রূহ ও নাফসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নাফসের জীবন নির্ভর করে রূহের উপর আর নাফস হলো মানুষের একটি সুরত বা আকৃতি। এটা আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, লোভ-লালসার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্য নাফসের চেয়ে বড় শত্রু আর কিছু নেই। নাফস শুধু দুনিয়ার মোহমায়ায় আকৃষ্ট। অপরপক্ষে, রূহ মানুষকে আখিরাতের দিকে উদ্বুদ্ধ করে ও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। আর শয়তানকে নাফস ও লালসার অধীন

করে দেয়া হয়েছে। ফেরেশতাদের রূহ ও জ্ঞানের সাথে মানুষের রূহের সম্পর্ক আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস বান্দাদের ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন সময় সাহায্য করে থাকেন। এই থিসিসের উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে রুহ বা আত্মা এবং তার পবিত্রতা কি এবং কেন তা নিয়ে আলোচনা করা। অনেকের মতে মানুষের নাফস তিনটি। এক. নাফসে মুতমায়িন্নাহ(প্রশান্ত আত্মা) দুই. নাফসে আম্মারাহ(খারাপ নাফস) তিন. নাফসে লাউয়ামাহ। প্রত্যেক মানুষের উপর কোন না কোন নাফস প্রাধান্য লাভ করে। মানুষের বাহ্যিক দেহ কখনো সুস্থ থাকে কখনো রোগাক্রান্ত হয়। তদ্রুপ মানুষের আত্মাও (রূহও) কখনো সুস্থ থাকে, কখনো অসুস্থ হয়। যেরূপভাবে সর্দি, কাশি, জ্বর ও বিভিন্ন প্রকার ব্যাথা নামক মানুষের শারীরিক রোগ আছে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক রোগ হলো- কুফর, শিরক, মুনাফিকী, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, গর্ব, লোভ, কৃপণতা, পদের মোহ, সম্পদের মোহ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। আর সুস্থতা হলো, স্বীয় মালিক আল্লাহপাককে চেনা, সকল লাভ ও ক্ষতি, সুখ ও দুঃখের মালিক আল্লাহপাককে মনে করা, তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা, যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, তাহলে ধৈর্য ধারণ করা। সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করা এবং আযাবের ভয় করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ফিকির করা, আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে তাঁর সকল হুকুম পালন করা। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপকরণ হলো পবিত্র কুরআন। বাতেনী গোনাহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পদ্ধতি চারটিঃ কামেল পীরের অনুসরণ, নিজের মুখলিস বন্ধুদেরকে আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের জন্য নিজের উপর নিয়োজিত করে নেয়া এবং নিজ শত্রু দ্বারা নিজের সংশোধন করানো। রোগ মুক্তির উপায় হলো নাফসের উপর নিউন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার তিনটি পদ্ধতি বুঝে আসে। একটি পদ্ধতি সাধারণ এবং সংক্ষেপ। অপর দু'টি বিশেষ এবং বিস্তারিত। সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো, অন্তরে আখিরাতের চিন্তা এবং আল্লাহপাকের নিকট জবাবদিহিতার কথা সব সময় জাগ্রত রাখা। দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وتواصوا بالصبر

অর্থাৎ, একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও। (সূরা আসর ৩ আঃ) ধৈর্যের অর্থ হলো, নফসের কামনা-বাসনা চরিতার্থ না করার দরুণ যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করা। আত্মার পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধির পদক্ষেপসমূহ: তাওবা, ধৈর্য, শোকর, যুহদ (দুনিয়া বিমুখত), তাওহীদ, তাওয়াক্কুল। সকল কিছুর উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা।

ভূমিকা

এই থিসিসের শুরুতে রুহ বা আত্মা বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা, প্রাচীণ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, দার্শনিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। তার পরের অংশে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী রুহ বা আত্মার পরিচয়, নফসের প্রকারভেদ, রোগ, প্রতিকার, পবিত্রতা বা আত্মশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মশুদ্ধির উপায় এবং পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রুহ বা আত্মা বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা

অনেক ধর্মীয় এবং দার্শনিক ঐতিহ্যে, **আত্মা** হল একজন ব্যক্তির অ-বস্তুগত সারাংশ, যার মধ্যে একজনের পরিচয়, ব্যক্তিত্ব এবং স্মৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, এমন একটি জীবন্ত সত্তার অজৈব দিক বা সারমর্ম যা দৈহিক মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হয়। আত্মার ধারণাটি সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যদিও এটি অন্যান্য জীবিত বা এমনকি নির্জীব সত্ত্বার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন অ্যানিমিজম।[1]

ব্যুৎপত্তি

আধুনিক ইংরেজি বিশেষ্য *আত্মা* পুরাতন ইংরেজি sāwol, sāwel থেকে উদ্ভূত হয়েছে। *অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে* রিপোর্ট করা প্রথম প্রত্যয়নগুলি ৪ম শতাব্দীর। রাজা আলফ্রেডের De Consolatione Philosophiae-এর অনুবাদে, এটি একজন ব্যক্তির জড়বস্তু, আধ্যাত্মিক বা চিন্তার দিকটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যক্তির শারীরিক শরীরের সাথে বৈপরীত্য; Vespasian Psalter 77.50- এ এর অর্থ "জীবন" বা "অ্যানিমেট অস্তিত্ব"। পুরানো ইংরেজি শব্দটি একই ধারণার জন্য অন্যান্য

ঐতিহাসিক জার্মানিক শব্দের সাথে সমন্বিত, যার মধ্যে রয়েছে ওল্ড ফ্রিসিয়ান *সেলে, সেল* (যার অর্থ "পরিত্রাণ" বা "গম্ভীর শপথ"ও হতে পারে), গথিক *সাইওয়ালা*, ওল্ড হাই জার্মান *সেউলা, সেলা*, ওল্ড স্যাক্সন *সেওলা* এবং ওল্ড নর্স *সালা*। বর্তমান সময়ের কগনেটের মধ্যে রয়েছে ডাচ *জিয়েল* এবং জার্মান *সিলে*।[2]

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদি ধর্ম বং কিছু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে, শুধুমাত্র মানুষেরই অমর আত্মা আছে। ইহুদি ধর্মের মধ্যে অমরত্ব বিতর্কিত এবং অমরত্বের ধারণা সম্ভবত প্লেটো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৩] উদাহরণস্বরূপ, টমাস অ্যাকুইনাস, সরাসরি অ্যারিস্টটলের অন দ্য *সোল* থেকে ধার করে, সমস্ত জীবের জন্য "আত্মা" (*অ্যানিম*) দায়ী করেছেন কিন্তু যুক্তি দিয়েছেন যে শুধুমাত্র মানুষের আত্মাই অমর।[4] অন্যান্য ধর্ম (সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে হিন্দুধর্ম এবং জৈনধর্ম) বিশ্বাস করে যে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পর্যন্ত সমস্ত জীবই হল আত্মা (আত্মা এবং জীব) এবং পৃথিবীতে তাদের শারীরিক প্রতিনিধি (দেহ) রয়েছে। প্রকৃত আত্মা হল আত্মা, অথচ দেহ হল সেই জীবনের কর্মফল অনুভব করার একটি প্রক্রিয়া। এইভাবে, যদি কেউ বাঘ দেখতে পায় তবে তার মধ্যে একটি আত্ম-সচেতন পরিচয় রয়েছে (আত্মা), এবং একটি শারীরিক প্রতিনিধি (বাঘের পুরো শরীর, যা পর্যবেক্ষণযোগ্য)। অনেক লোক বিশ্বাস করে যে নদী এবং পাহাড়ের মতো অ-জৈবিক জিনিসেরও আত্মা আছে। এই বিশ্বাসকে অ্যানিমিজম বলা হয়।[৫]

1. *"আত্মা" । ব্রিটানিকা । সংগৃহীত* 19 *জুন* 2022 ।
2. ^ *"আত্মা, এন।"* OED *অনলাইন । অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস । সংগৃহীত* 23 *জুন* 2022 ।
3. ^ঝাঁপ দাও: a b *"আত্মার অমরত্ব"*। jewishencyclopedia.com । 20 *ডিসেম্বর* 2016 *এ মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত* 14 *ডিসেম্বর* 2016
4. ^ পিটার ইয়ার্ডলি এবং কার্ল স্টিল, *অ্যাকুইনাস: এ গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড* (লন্ডন: কন্টিনিউম, 2010), পৃষ্ঠা 34-35

5. ^ "সোল" , *কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া*, ষষ্ঠ সংস্করণ। 2001-07। সংগৃহীত 12 নভেম্বর 2008.

প্রাচীন নিকট পূর্ব



পে এবং নেখেনের আত্মারা অ্যাবিডোসে দ্বিতীয় রামেসিসের মন্দিরে রাজকীয় বজরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে

প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে , একজন ব্যক্তি বিভিন্ন উপাদান, কিছু শারীরিক এবং কিছু আধ্যাত্মিক দ্বারা গঠিত বলে বিশ্বাস করা হত। প্রাচীন অ্যাসিরিয়ান এবং ব্যাবিলনীয় ধর্মেও অনুরূপ ধারণা পাওয়া যায়। কুত্তামুওয়া স্টেলে , ৪ম শতাব্দীর খ্রিস্টপূর্বাব্দে সামালের একজন রাজকীয় কর্মকর্তার জন্য একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্টিল , কুত্তামুওয়া বর্ণনা করে যে তার শোক পালনকারীরা তার জীবন এবং তার পরকালকে ভোজের সাথে স্মরণ করে "আমার আত্মার জন্য যে এই স্টিলে আছে" । এটি দেহ থেকে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে আত্মার প্রাচীনতম উল্লেখগুলির মধ্যে একটি। 800-পাউন্ড (360 কেজি) ব্যাসল্ট স্টিল 3 ফুট (0.91 মিটার) লম্বা এবং 2 ফুট (0.61 মিটার) চওড়া। এটি শিকাগো, ইলিনয়ের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের নিউবাউয়ার অভিযান দ্বারা খননের তৃতীয় মৌসুমে উন্মোচিত হয়েছিল । [একটি]

বাহাই বিশ্বাস

বাহাই বিশ্বাস নিশ্চিত করে যে "আত্মা হল ঈশ্বরের একটি চিহ্ন, একটি স্বর্গীয় রত্ন যার বাস্তবতা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং যার রহস্য কোন মন, যতই তীব্র হোক না কেন, উন্মোচনের আশা করতে পারে না"। [7] বাহাউল্লাহ বলেছেন যে আত্মা কেবল মানব দেহের দৈহিক মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে না বরং প্রকৃতপক্ষে অমর। [8] স্বর্গকে আংশিকভাবে ঈশ্বরের নৈকট্যের আত্মার অবস্থা এবং নরককে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরত্বের অবস্থা হিসাবে দেখা যেতে পারে। প্রতিটি রাষ্ট্র আধ্যাত্মিকভাবে বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা বা এর অভাবের স্বাভাবিক ফলাফল হিসাবে অনুসরণ করে। [9] বাহাউল্লাহ শিখিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে তাদের জীবনের আগে ব্যক্তিদের কোন অস্তিত্ব নেই এবং আত্মার বিবর্তন সর্বদা ঈশ্বরের দিকে এবং বস্তুজগত থেকে দূরে। [9]

6 *"পাওয়া হয়েছে: আত্মার একটি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ"।নিউ ইয়র্ক টাইমস।* 17 *নভেম্বর* 2008 *।*24 *এপ্রিল* 2009 *তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত*18 *নভেম্বর*2008 .

7 ^ *বাহাউল্লাহ*(1976) *।বাহাউল্লাহর লেখা থেকে সংগ্রহ। উইলমেট, ইলিনয়: বাহাই পাবলিশিং ট্রাস্ট। পৃ.* 158-63 *। আইএসবিএন* 978-0-87743-187-9. *সংগৃহীত*23 *ফেব্রুয়ারি*2016 .

8 ^ *বাহাউল্লাহ*(1976) *।বাহাউল্লাহর লেখা থেকে সংগ্রহ। উইলমেট, ইলিনয়: বাহাই পাবলিশিং ট্রাস্ট। পৃ.* 155-58 *। আইএসবিএন* 978-0-87743-187-9. *সংগৃহীত*23 *ফেব্রুয়ারি*2016 .

9 ^ঝাঁপ দাও:a b *তাহেরজাদেহ, আদিব*(1976) *। বাহাউল্লাহর প্রকাশ, ভলিউম* 1 *। অক্সফোর্ড: জর্জ রোনাল্ড।আইএসবিএন* 978-0-85398-270-8. 3 *মার্চ* 2016 *তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত*23 *ফেব্রুয়ারি*2016 .

বৌদ্ধধর্ম

আত্মা, আত্মা বা অহং সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যগত মতবাদ হল যে এটি একটি পৃথক, স্থায়ী সত্তা হিসাবে অস্তিত্বহীন। আত্মের অ-অস্তিত্ব (অনাত্মান), সমস্ত কিছুর অস্থিরতা (অনিত্য), এবং আত্ম ও স্থায়িত্বের ধারণার সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে জীবের দ্বারা অনুভব করা কষ্ট (দুখ) প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ধারণা । বুদ্ধ-প্রকৃতির মতবাদ

, যখন কখনও কখনও একটি "সত্যিকারের আত্মা" বা "আত্মা"-এর উল্লেখ করে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, আসলে তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য অনাত্মানের ধারণার গ্রহণের উপর নির্ভর করে ।[10]

খ্রিস্টধর্ম



উইলিয়াম বোগুয়েরো দ্বারা দুই দেবদূত দ্বারা একটি আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার চিত্র

কিছু খ্রিস্টান ইস্ক্যাটোলজি অনুসারে, মানুষ মারা গেলে, তাদের আত্মা ঈশ্বরের দ্বারা বিচার করা হবে এবং পুনরুত্থানের অপেক্ষায় স্বর্গে বা হেডিসে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে । খ্রিস্টধর্মের প্রাচীনতম বিদ্যমান শাখা, ক্যাথলিক চার্চ এবং পূর্ব ও ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্স চার্চগুলি এই মতকে মেনে চলে, সেইসাথে অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ও। কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান আত্মাকে জীবন হিসাবে বোঝে এবং বিশ্বাস করে যে পুনরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত মৃতদের কোন সচেতন অস্তিত্ব নেই (এটি খ্রিস্টান শর্তবাদ নামে পরিচিত)। কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে অধার্মিকদের আত্মা এবং দেহ চিরকালের জন্য (বিনাশবাদ) ভোগ করার পরিবর্তে নরকে ধ্বংস হবে। বিশ্বাসীরা স্বর্গে বা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবে এবং ঈশ্বরের সাথে চিরন্তন সহভাগিতা উপভোগ করবে। অন্যান্য খ্রিস্টানরা আত্মার শাস্তি প্রত্যাখ্যান করে।[11]

প্রেরিত পল *সাইকে* (ψυχή) এবং *নিউমা* (πνεῦμα) ব্যবহার করেছেন বিশেষভাবে *নেফেশ* (נפש) এবং ruah (רוח) এর ইহুদি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, যার অর্থ আত্মা,[12] (এছাড়াও সেপ্টুয়াজিন্টে, যেমন জেনেসিস:2אֱלֹהִים □□· = πνεῦμα θεοῦ = spiritus Dei = "ঈশ্বরের আত্মা")। খ্রিস্টানরা সাধারণত আত্মার অস্তিত্ব এবং অনন্ত, অসীম প্রকৃতিতে বিশ্বাস করে।[13]

10 *শিহ, হেং-চিং।' তথাগৎগর্ভ-এর তাৎপর্য-'সুন্যতা-এর একটি ইতিবাচক অভিব্যক্তি* 15 *জুলাই* 2023 *সংগৃহীত।*

11^"*মৃত্যুর পরের জীবন - স্বর্গ, নরক, এবং শোধনকারী" । খ্রিস্টধর্মে পরিত্রাণ । বিবিসি বাইটসাইজ গাইড ।* GCSE *রিলিজিয়াস স্টাডিজ রিভিশন* - OCR.

12^ Αρχιμ / Βλάχος' Ιερόθεος (30 *সেপ্টেম্বর* 1985) ।"*ক্যাফ্যালিও গ* " (*পিডিএফ)* । Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία (*গ্রীক ভাষায়)।* Εδεσσα: Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού· p. Τι είνψχχ 5 January . 2023 ।

13^ *হারারি, ইউভাল এন.* (2017) ।*হোমো ডিউস: আগামীকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*(1*ম মার্কিন সংস্করণ)। নিউ ইয়র্ক:হার্পার । পি.* 92. *আইএসবিএন* 978-0-06-246431-6. *ওসিএলসি* 951507538 ।

আত্মার উৎপত্তি

আত্মার উৎপত্তি" খ্রিস্টধর্মে একটি উদ্বেগজনক প্রশ্ন প্রদান করেছে। সামনে রাখা প্রধান তত্ত্বগুলির মধ্যে রয়েছে আত্মা সৃষ্টিবাদ , ট্রেডুসিয়ানিজম এবং প্রাক-অস্তিত্ব । আত্মা সৃষ্টিবাদ অনুসারে, ঈশ্বর প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মাকে সরাসরি সৃষ্টি করেন, হয় গর্ভধারণের মুহূর্তে বা পরবর্তী সময়ে। ট্রাডুসিয়ানিজম অনুসারে, আত্মা জন্মগতভাবে পিতামাতার কাছ থেকে আসে। প্রাক-অস্তিত্ব তত্ত্ব অনুসারে, আত্মা গর্ভধারণের মুহুর্তের আগে বিদ্যমান। মানব ভ্রূণে গর্ভধারণ থেকে আত্মা আছে কিনা, বা গর্ভধারণ এবং জন্মের মধ্যে এমন একটি বিন্দু আছে কিনা যেখানে ভ্রূণ আত্মা , চেতনা এবং/অথবা ব্যক্তিত্ব অর্জন করে সে সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা রয়েছে । এই প্রশ্নে অবস্থানগুলি গর্ভপাতের নৈতিকতার বিচারে ভূমিকা পালন করে ।[14][15][16]

আত্মার ট্রাইকোটমি

কিছু খ্রিস্টান মানুষের একটি ট্রাইকোটমিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে, যা মানুষকে একটি দেহ (*সোমা*), আত্মা (*সাইকি*) এবং আত্মা (*নিউমা*) নিয়ে গঠিত হিসাবে চিহ্নিত করে।[খ] যাইহোক, বেশিরভাগ আধুনিক বাইবেল পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে

"আত্মা" এবং "আত্মা" ধারণাগুলি অনেক বাইবেলের অনুচ্ছেদে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাই দ্বিধাবিভক্তিকে ধরে রাখে: এই দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রতিটি মানুষ একটি দেহ এবং একটি আত্মা নিয়ে গঠিত। . পল বলেছিলেন যে "দেহ আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে", "কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং সক্রিয় এবং যেকোনো দুই ধারের তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ, এবং আত্মা ও আত্মার বিভাজন পর্যন্ত বিদ্ধ হয়" (Heb 4:12 NASB) , এবং যে "আমি আমার শরীর বুফে", এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে.

টোটা ইন টোটো কর্পোর

টমাস অ্যাকুইনাসের মতে , আত্মা *সম্পূর্ণ দেহে টোটা* ।[18][19][20] এর মানে হল যে আত্মা সম্পূর্ণরূপে মানবদেহের প্রতিটি অংশে নিহিত, এবং তাই সর্বব্যাপী এবং একটি একক অঙ্গ যেমন হৃদয় বা মস্তিষ্কে স্থাপন করা যায় না, বা এটি থেকে পৃথক করা যায় না। body (শরীরের মৃত্যুর পরে ছাড়া)। *ডি ট্রিনিটেটের* চতুর্থ বইতে , হিপ্পোর অগাস্টিন বলেছেন যে আত্মা সমস্ত শরীরে এবং এর যে কোনও অংশে রয়েছে।[21]

14 *পাচোলসিক, তাদেউস, ফাদার, পিএইচডি।"ভ্রূণের কি আত্মা আছে?". ক্যাথলিক শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র।*Catholiceducation.org . 29 *জুন* 2011 *তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে । সংগৃহীত*13 *নভেম্বর* 2011 .

15^ *সৈয়দ, ম্যাথিউ (*12 *মে* 2008) *।"ভ্রূণের আত্মা আছে? কি বাজে কথা"।টাইমস। লন্ডন, যুক্তরাজ্য।*18 *সেপ্টেম্বর* 2011 *তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে । সংগৃহীত*13 *নভেম্বর*2011 .

16^ *জোন্স, ডেভিড আলবার্ট (*2005) *।ভ্রূণের আত্মা: খ্রিস্টান ঐতিহ্যে মানব ভ্রূণের অবস্থা সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান। কন্টিনিউম প্রেস। আইএসবিএন* 978-0-8264-6296-1.

18 *অ্যাকুইনাস, টমাস ।*"Quaestio decima: Vtrum anima sit in toto corpore et in qualibet parte eius?" . Quaestiones Disputatae de Anima [*আত্মার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিষয়*] (*ল্যাটিনে)।* §10 *।*

19^ *অ্যাকুইনাস, টমাস*(1274) *।*Summa Theologiae [*সমস্ত ধর্মতত্ত্ব*] (*ল্যাটিনে)। দ্বিতীয় প্রশ্ন* 76. এছাড়াও দেখুন

ক্লেইন, সি. (1655) *।একটি অ্যানিমা সিট টোটা ইন টোটো কর্পোরে, এবং টোটা ইন কোয়ালিবেট পার্ট, ডিস্কুসিটিও ফিলোসফিকা(ল্যাটিন ভাষায়)। গোয়েটশিউস। ওসিএলসি* 253546381 *।*

20^ *পেপে, জিওভানি (*19 *নভেম্বর* 2023) *।* "Recenti Studii Su la Metafisica dell'anima" *। রিভিস্তা ডি ফিলোসোফিয়া নিও-স্কোলাস্টিকা ।* **11** (2): 167-194 *।*JSTOR 43065579 *।*

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম

ক্যাথলিক চার্চের বর্তমান ক্যাটিসিজম বলে যে "['আত্মা' শব্দটি] [ব্যক্তিদের] অভ্যন্তরীণ দিকটিকে বোঝায়, যা [তাদের] মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান, যেটির দ্বারা [তারা] বিশেষ করে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে : 'আত্মা' [মানবতার] আধ্যাত্মিক নীতিকে বোঝায়।" [22] জীবিত এবং মৃত সমস্ত আত্মা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা বিচার করা হবে যখন তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। ক্যাথলিক চার্চ শিক্ষা দেয় যে প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, এই বলে: "বিশ্বাসের মতবাদ নিশ্চিত করে যে আধ্যাত্মিক এবং অমর আত্মা ঈশ্বরের দ্বারা অবিলম্বে সৃষ্টি হয়েছে।" [23]



স্লিপি হোলোর ওল্ড ডাচ চার্চের কবরস্থানে 17 শতকের সমাধির পাথরে আত্মার চিত্র

প্রোটেস্ট্যান্টবাদ

প্রোটেস্ট্যান্টরা সাধারণত আত্মার অস্তিত্ব এবং অমরত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু পরকালের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ কী তা নিয়ে দুটি প্রধান শিবিরে পড়ে । কেউ কেউ, জন ক্যালভিনের অনুসরণ করে , বিশ্বাস করেন যে আত্মা মৃত্যুর পরে চেতনা হিসাবে টিকে থাকে । [24] অন্যরা, মার্টিন লুথারকে অনুসরণ করে , বিশ্বাস করে যে আত্মা শরীরের সাথে মারা যায় এবং মৃতদের পুনরুত্থান পর্যন্ত অচেতন ("ঘুম") থাকে । [25][26]

22 *"অনুচ্ছেদ 363" । ক্যাথলিক চার্চের ক্যাটেসিজম । সংগৃহীত 1 মার্চ 2023 – Vatican.va এর মাধ্যমে।*

23 *^ "অনুচ্ছেদ 382" । ক্যাথলিক চার্চের ক্যাটেসিজম । 16 নভেম্বর 2011 তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে । সংগৃহীত 13 নভেম্বর 2011 – Vatican.va এর মাধ্যমে।*

24 *হেলম, পল (2006) । জন ক্যালভিনের ধারনা । পি. 129. আত্মার অমরত্ব: ক্যালভিনের ক্রিস্টোলজি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি, ক্যালভিন হল একটি পদার্থ দ্বৈতবাদী।*

25 গ্রাফটন, *অ্যান্টনি; সর্বাধিক, গ্লেন ডব্লিউ.*; Settis, Salvatore (2010) *। শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য । পি.* 480. *বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে, লুথার অবজ্ঞার সাথে উল্লেখ করেছেন যে কাউন্সিল ফাদাররা আত্মাকে অমর বলে ঘোষণা করেছিলেন।*

26 ^ *মারিয়াস, রিচার্ড*(1999) *। মার্টিন লুথার: ঈশ্বর এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী খ্রিস্টান । পি.* 429. *লুথার, মৃত্যুতে আত্মার ঘুমে বিশ্বাসী, এখানে ধরে রাখা হয়েছে যে পুনরুত্থানের মুহূর্তে... ধার্মিকরা আকাশে খ্রীষ্টের সাথে দেখা করতে উঠবে, অধার্মিকরা বিচারের জন্য পৃথিবীতে থাকবে, ...*

হিন্দুধর্ম

আত্মা একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ অন্তর্নিহিত বা আত্মা । [ঘ][ই][চ] হিন্দু দর্শনে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের বেদান্ত বিদ্যালয়ে, *আত্মান* হল প্রথম নীতি, [48] একজন ব্যক্তির প্রকৃত আত্ম যা ঘটনার সাথে সনাক্তকরণের বাইরে, একজন ব্যক্তির সারাংশ। মুক্তি (*মোক্ষ*) অর্জনের জন্য, একজন মানুষকে অবশ্যই আত্ম-জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) অর্জন করতে হবে, *যা* বুঝতে হবে যে অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে একজনের প্রকৃত আত্ম (*আত্মান*) *অতীন্দ্রিয় স্ব*-ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন । [46][g] হিন্দুধর্মের ছয়টি গোঁড়া স্কুল বিশ্বাস করে যে প্রতিটি সত্তার মধ্যেই *আত্মা* (আত্ম, সার) আছে । [50][51][52][এইচ][53]

হিন্দুধর্ম এবং জৈনধর্মে, একটি *জীব* (সংস্কৃত : जीव, *জীব*, বিকল্প বানান *জিওয়া*; হিন্দি : जीव, *जीव*, বিকল্প বানান *জীব*) হল একটি জীব, বা জীবনী শক্তি দ্বারা আবদ্ধ যেকোন সত্তা। [54] *জৈন ধর্মে জীবের* ধারণা হিন্দুধর্মের *আত্মানের* অনুরূপ ; যাইহোক, কিছু হিন্দু ঐতিহ্য দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করে, *জীবকে* স্বতন্ত্র আত্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে আত্মাকে সর্বজনীন অপরিবর্তনীয় আত্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা সমস্ত জীবের মধ্যে বিদ্যমান এবং অন্য সব কিছুর মধ্যে আধিভৌতিক ব্রহ্ম হিসাবে বিবেচিত হয় । [55][56][57] পরেরটিকে কখনও কখনও *জীব-আত্মান* (জীবন্ত দেহের একটি আত্মা) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। [55]

46 Lorenzen, D.(2004) *। মিত্তল, সুশীল*; Thursby, Gene (eds.) *হিন্দু বিশ্ব । রাউটলেজ । পৃষ্ঠা* 208-209 *।আইএসবিএন* 0-415-21527-7.

50 জয়তিল্লেকে, কেএন(2010)। জ্ঞানের প্রাথমিক বৌদ্ধ তত্ত্ব। মতিলাল বেনারসীদাস প্রকাশ। pp. 246–249, নোট 85 থেকে। আইএসবিএন 978-81-208-0619-1.
51 ^ কলিন্স, স্টিভেন (1994)। রেনল্ডস, ফ্রাঙ্ক; ট্রেসি, ডেভিড (সম্পাদনা)। ধর্ম এবং ব্যবহারিক কারণ। স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস। পি. 64. আইএসবিএন 978-0-7914-2217-5.
52 ^ঝাঁপ দাও:[a b] শঙ্কর, আচার্য(1908) ।" পরিচয়"। বৃহদ আরণ্যক উপনিষদ এবং এর প্রথম অধ্যায়ে শঙ্কর আচার্যের ভাষ্য। রোর, এডওয়ার্ড দ্বারা অনুবাদিত। সোসাইটি ফর দ্য রিসাসিটেশন অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার। পি. 2 (উদ্ধৃতি), পৃষ্ঠা 2-4 – গুগল বইয়ের মাধ্যমে।
53 ^ জাভানাউদ, কেটি (জুলাই-আগস্ট 2013)। "বৌদ্ধ' ন-স্ব মতবাদ কি নির্বাণ অনুসরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ?". দর্শন এখন। নং 97.6 ফেব্রুয়ারি 2015 তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত17 সেপ্টেম্বর 2024 – philosophynow.org এর মাধ্যমে।
54 হল, ম্যাথিউ (2011)। ব্যক্তি হিসাবে উদ্ভিদ: একটি দার্শনিক উদ্ভিদবিদ্যা। স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক প্রেস। পি. 76. আইএসবিএন 978-1-4384-3430-8.
55 ^ঝাঁপ দাও:[a b] Varenne, Jean(1989)। যোগ এবং হিন্দু ঐতিহ্য।মতিলাল বেনারসীদাস। পৃষ্ঠা 45-47 ।আইএসবিএন 978-81-208-0543-9.
56 ^ মায়ার্স, মাইকেল (2013)। ব্রাহ্মণ: একটি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। রাউটলেজ। পৃষ্ঠা 140-143 । আইএসবিএন 978-1-136-83565-0.
57 ^ Tymieniecka, আনা তেরেসা (1994)। " তৃতীয় অধ্যায়: সৃজনশীল স্ব এবং অন্যটি পবিত্রের সন্ধানে"। টিসনারে, জোজেফ; Życiński, Józef; ম্যাকক্লিন, জর্জ (সম্পাদনা)। ব্যক্তির দর্শন: সংহতি এবং সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা। পোলিশ দার্শনিক স্টাডিজ। ভলিউম I. Washington, DC: Paideia Publishers/ Council for Research in Values and Philosophy. পি. 32. আইএসবিএন 9781565180499.
ম্যাকলিন, জর্জ এফ.; মেনেল, হুগো অ্যান্টনি(1988)। আধিভৌতিক জ্ঞানের প্রকৃতি। ওয়াশিংটন, ডিসি: মূল্যবোধ এবং দর্শনে গবেষণার জন্য কাউন্সিল। পি. 32. আইএসবিএন 9780819169266.

ইসলাম

পবিত্র গ্রন্থ কুরআন, আত্মাকে বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে: *রুহ* (আত্মা, চেতনা, নিউমা বা আত্মা হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে) এবং *নফস (আত্ম, অহং,* মানসিকতা বা আত্মা হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে), [58][59] হিব্রু *রুচ* এবং *নেফেশের* পরিচিতি । দুটি শব্দ প্রায়শই পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়, যদিও *রুহ* প্রায়শই ঐশ্বরিক আত্মা বা "জীবনের নিঃশ্বাস" বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যখন *নফস* একজনের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। [৬০] ইসলামী দর্শনে, অমর রূহ নশ্বর নফসকে "চালিত" করে, যা জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী আকাঙ্ক্ষা এবং উপলব্ধি নিয়ে গঠিত। [৩]

কুরআনের বেশ কিছু আয়াত যা রুহের কথা উল্লেখ করে 17 অধ্যায়ে ("দ্য নাইট জার্নি") এবং 39 ("দ্য ট্রুপস") এ রয়েছে।

এবং তারা আপনাকে (হে মুহাম্মদ) রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, রূহ আমার পালনকর্তার বিষয়। আর মানুষকে সামান্য ব্যতীত জ্ঞান দেওয়া হয়নি।

- *কুরআন* 17:85

আর মনে মনে তোমার রবকে স্মরণ কর

— *কুরআন* 7:205

আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন এবং যারা মারা যায় না তাদের ঘুমের সময় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

- *কুরআন* 39:42

*58 দেউরাসেহ, নুরদিন; আবু তালিব, মনসর (*2005)*। "ইসলামী চিকিৎসা ঐতিহ্যে মানসিক স্বাস্থ্য"। আন্তর্জাতিক মেডিকেল জার্নাল ।* **4** (2): 76–79 *।*

*59 ^ ব্রাগাজি, এনএল; খাব্বাছে, এইচ; ইত্যাদি (*2018)*। "ইসলামের নিউরোথিওলজি এবং উচ্চতর চেতনা রাষ্ট্র" । কসমস অ্যান্ড হিস্ট্রি: দ্য জার্নাল অফ ন্যাচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল ফিলোসফি ।* **14** (2): 315-21 *।*

60 ^ ম. এমিল হোমরিন (2006)*। "আত্মা"। জেন ড্যামেন ম্যাকঅলিফে (সম্পাদনা)। কোরআনের এনসাইক্লোপিডিয়া । ভলিউম* 5. *ব্রিল।*

জৈন ধর্ম

জৈন ধর্মে, উদ্ভিদ বা ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি জীবের একটি আত্মা আছে এবং ধারণাটি জৈন ধর্মের ভিত্তি তৈরি করে। জৈন ধর্মের মতে, আত্মার অস্তিত্বের কোন শুরু বা শেষ নেই। এটি প্রকৃতিতে চিরন্তন এবং মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তার রূপ পরিবর্তন করে। জৈনধর্মে, *জীব* হল একটি জীবন্ত প্রাণীর অমর সারাংশ বা আত্মা, যেমন মানুষ, প্রাণী, মাছ বা উদ্ভিদ, যা শারীরিক মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকে। [61] জৈন ধর্মে *অজিবের* ধারণার অর্থ "আত্মা নয়", এবং বস্তু (শরীর সহ), সময়, স্থান, অ-গতি এবং গতির প্রতিনিধিত্ব করে। [61] জৈন ধর্মে, একজন *জীব* হয় *সংসারী* (জাগতিক, পুনর্জন্মের চক্রে ধরা পড়ে) অথবা *মুক্ত* (মুক্ত)। [62][63]

এই বিশ্বাস অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা *সংসার* (পুনরাবৃত্তির জন্ম ও মৃত্যুর চক্র) থেকে মুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি পৃথক আত্মার কর্মের (ক্রিয়া) উপর ভিত্তি করে এই দেহগুলির একটির সাথে সংযুক্ত থাকে ।আত্মা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সে একই গুণ ও গুণাবলী পেয়েছে। মুক্ত এবং অমুক্ত আত্মার মধ্যে পার্থক্য হল যে গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যগুলি *সিদ্ধের* (মুক্ত আত্মার) ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় কারণ তারা সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন অতিক্রম করেছে যেখানে অমুক্ত আত্মার ক্ষেত্রে তারা আংশিকভাবে প্রদর্শিত হয়। দৈহিক দেহের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও যে আত্মা দুষ্ট আবেগের উপর বিজয়ী হয়ে ওঠে তাদের অরিহন্ত বলা হয় ।[৬৪]

আত্মার জৈন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে, বীরচাঁদ গান্ধী বলেছিলেন যে "আত্মা তার নিজের জীবন যাপন করে, দেহের উদ্দেশ্যে নয়, দেহ আত্মার উদ্দেশ্যে বাস করে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে শরীর তখন আত্মা তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।" [৬৫]

61 J Jaini (1940) । *জৈন ধর্মের রূপরেখা । কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ।* pp. xxii–xxiii ।

62 ^ *জৈনী, জগমন্দর-লাল (*1927), *গোমতসার জীব-কাণ্ড, পৃ.* 54 Alt URL

63 ^ *সারাও, কেটিএস; লং, জেফরি ডি. , এডিস। (*2017) । *"জীবা"।বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম । ভারতীয় ধর্মের এনসাইক্লোপিডিয়া । স্প্রিংগার নেদারল্যান্ডস । পি.* 594. doi : 10.1007/978-94-024-0852-2_100397 । *আইএসবিএন* 978-94-024-0851-5.

64 ^ Sangave, Vilas Adinath (2001). Aspects of Jaina religion (3 ed.). Bharatiya Jnanpith. pp. 15–16. ISBN 81-263-0626-2.

65 ^ "Forgotten Gandhi, Virchand Gandhi (1864–1901) – Advocate of Universal Brotherhood". All Famous Quotes. Archived from the original on 21 September 2013.

ইহুদি ধর্ম

হিব্রু পদ נפש nefesh (আক্ষরিক অর্থে "জীবন্ত সত্তা"), רוח ruach (আক্ষরিক অর্থে "বাতাস"), נשמה Neshamah (আক্ষরিক অর্থে "শ্বাস"), חיה chayah (আক্ষরিক অর্থে "জীবন") এবং יחידה yechidah (আক্ষরিক অর্থে " এককতা") আত্মা বা আত্মা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।[66] ইহুদি ধর্মে, প্রাথমিকভাবে আত্মার ধারণা ছিল না। জেনেসিসে দেখা যায়, ঐশ্বরিক শ্বাস কেবল অ্যানিমেটেড দেহ। তারপর প্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ধূলিকণা তৈরি করলেন এবং তার নাকের মধ্যে জীবনের নিঃশ্বাস ফুঁকলেন; এবং তাই মানুষ একটি জীবিত প্রাণী হয়ে ওঠে.

— আদিপুস্তক 2:7 ইহুদি ধর্ম একজনের আত্মার গুণগত মানকে একজনের আদেশ পালনের সাথে সম্পর্কিত করে (*মিটজভোট*) এবং বোঝার উচ্চ স্তরে পৌঁছানো এবং এইভাবে ঈশ্বরের নৈকট্য। এমন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বলা হয় *তাজদিক*। তাই, ইহুদি ধর্ম একজনের মৃত্যুর দিনটির স্মৃতিচারণকে গ্রহণ করে, *নাহালা* / *ইয়াহর্টজিট*, জন্মদিনকে নয়,[৬৭] স্মরণের উৎসব হিসাবে, কারণ জীবনের সংগ্রাম, পরীক্ষা এবং চ্যালেঞ্জের শেষের দিকে মানুষের আত্মাকে বিচার ও কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে। ধার্মিকতার জন্য[68] ইহুদি ধর্ম আত্মার অধ্যয়নের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।[৬৯]

কাব্বালা এবং অন্যান্য অতীন্দ্রিয় ঐতিহ্যগুলি আত্মার প্রকৃতিতে আরও বিশদে যায়। কাব্বালা আত্মাকে পাঁচটি উপাদানে বিভক্ত করে, পাঁচটি জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:[70][71]

1. নেফেশ, প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত।
2. রুচ, আবেগের সাথে সম্পর্কিত।
3. নেশামঃ, বুদ্ধি সম্পর্কিত।
4. ছায়া, যা ঈশ্বরের অতিক্রমের দিকে তাকায়।
5. ইয়েচিদাহ, আত্মার সারাংশ, যা ঈশ্বরের সাথে আবদ্ধ।

কাব্বালাহ পুনর্জন্মের একটি ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন, *গিলগুল* (*নেফেশ হাবেহামিত*- "প্রাণীর আত্মা")।[72] কিছু ইহুদি ঐতিহ্য দাবি করে যে আত্মা *লুজ* হাড়ের মধ্যে থাকে, যদিও ঐতিহ্যগুলি মেরুদণ্ডের শীর্ষে অ্যাটলাস বা মেরুদণ্ডের নীচে স্যাক্রাম তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে ।

66 Zohar, Rayah Mehemna, Terumah 158b. See Leibowitz, Aryeh (2018). The Neshamah: A Study of the Human Soul. Feldheim Publishers. pp. 27, 110. ISBN 1-68025-338-7

67 ^ The only person mentioned in the Torah celebrating birthday (party) is the wicked pharaoh of Egypt Genesis 40:20–22.

68 ^ "About Jewish Birthdays". Judaism 101. Aish.com. Archived from the original on 22 August 2013. Retrieved 11 July 2013.

69 ^ "Soul". jewishencyclopedia.com. Archived from the original on 8 March 2016.

70 ^ "Nurturing The Human Soul—From Cradle To Grave". Chizuk Shaya: Dvar Torah Resource. 6 January 2013. Retrieved 10 June 2022.

71 ^ "Neshamah: Levels of Soul Consciousness". Chabad.org Kabbalah Online. Retrieved 24 April 2024.

শিখ ধর্ম

শিখ ধর্ম আত্মাকে (*আত্মা)* ঈশ্বরের (ওয়াহেগুরু) অংশ বলে মনে করে। পবিত্র গ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেব (SGGS) থেকে বিভিন্ন স্তোত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে যা এই বিশ্বাসের পরামর্শ দেয়। "ঈশ্বর আত্মার মধ্যে এবং আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে।" [95] একই ধারণা SGGS এর বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে যে "আত্মা হল ঐশ্বরিক; ঐশ্বরিক হল আত্মা। তাকে ভালবাসার সাথে উপাসনা কর", [96] এবং "আত্মা হল প্রভু, এবং প্রভু হল আত্মা; শব্দের কথা চিন্তা করলে প্রভু পাওয়া যায়।" [97]

শিখ ধর্ম অনুসারে আত্মা বা *আত্মা* মানবদেহে একটি সত্তা বা "আধ্যাত্মিক স্ফুলিঙ্গ" বা "আলো" - যার কারণে দেহ জীবনকে টিকিয়ে রাখতে পারে। দেহ থেকে এই সত্তার প্রস্থানের সময়, দেহটি প্রাণহীন হয়ে যায় - শরীরের কোনও পরিমাণ হেরফের ব্যক্তিকে কোনও শারীরিক ক্রিয়া করতে বাধ্য করতে পারে না। আত্মা হল দেহের "চালক"। এটি *রুহ* বা আত্মা বা *আত্মা*, যার উপস্থিতি ভৌত দেহকে জীবন্ত করে তোলে।

অনেক ধর্মীয় এবং দার্শনিক ঐতিহ্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যে আত্মা হল ইথারিয়াল পদার্থ - একটি আত্মা ; একটি অ-বস্তুগত স্পার্ক - বিশেষ করে একটি অনন্য জীবন্ত প্রাণীর জন্য। এই ধরনের ঐতিহ্যগুলি প্রায়শই আত্মাকে অমর এবং সহজাতভাবে তার অমর প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন বলে মনে করে, সেইসাথে প্রতিটি জীবের মধ্যে অনুভূতির প্রকৃত ভিত্তি। পরকালের ধারণার সাথে আত্মার ধারণার দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে, তবে মৃত্যুর পরে

আত্মার কী ঘটে সে সম্পর্কে একটি প্রদত্ত ধর্মের মধ্যেও মতামত ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। এই ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে অনেকেই আত্মাকে বস্তুহীন হিসেবে দেখেন, অন্যরা এটিকে সম্ভবত বস্তুগত বলে মনে করেন।

95 এসজিজিএস, এম 1, পৃ. 1153।
96 ^ এসজিজিএস, এম 4, পৃ. 1325।
97 ^ এসজিজিএস, এম 1, পৃ. 1030

তাওবাদ

চীনা ঐতিহ্য অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তির দুই ধরনের আত্মা থাকে যার নাম হুন এবং পো (চীনা :魂 এবং 魄; পিনয়িন : *হুন এবং পো*), যা যথাক্রমে ইয়াং এবং ইয়িন । তাওবাদ দশটি আত্মায় বিশ্বাস করে, *সানহুনকিপো* (চীনা :三魂七魄 ; পিনয়িন : Sān hún qī pò) (三魂七魄) "তিন *হুন* এবং সাত *পো*" ।[98] একটি জীবিত প্রাণী যে তাদের মধ্যে কাউকে হারায় তাকে মানসিক অসুস্থতা বা অচেতনতা বলে বলা হয় , যখন একটি মৃত আত্মা একটি অক্ষমতা , নিম্ন আকাঙ্ক্ষা রাজ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারে , এমনকি পুনর্জন্মে অক্ষমও হতে পারে।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রীক দার্শনিক, যেমন সক্রেটিস , প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল , বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মার (ψυχή, psykhḗ) অবশ্যই একটি যৌক্তিক ফ্যাকাল্টি থাকতে হবে, যার ব্যায়াম ছিল মানুষের কর্মের মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বরিক।[106] তার প্রতিরক্ষা বিচারে, সক্রেটিস এমনকি তার শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে তার সহকর্মী এথেনিয়ানদের মানসিক বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার জন্য একটি উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ সমস্ত শারীরিক পণ্য এই ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভরশীল (*ক্ষমা* 30a–b)। অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়েছিলেন যে একজন

মানুষের শরীর এবং আত্মা যথাক্রমে তার বিষয় এবং ফর্ম: শরীর উপাদানগুলির একটি সংগ্রহ এবং আত্মা হল সারাংশ। আত্মা বা সাইকি (প্রাচীন গ্রীক : ψυχή psykhḗ , ψύχειν psýkhein , "শ্বাস নেওয়া", cf. ল্যাটিন *অ্যানিমা*) একটি জীবের মানসিক ক্ষমতা নিয়ে গঠিত: কারণ, চরিত্র, স্বাধীন ইচ্ছা , অনুভূতি, চেতনা , গুণ , স্মৃতি, উপলব্ধি চিন্তা, এবং তাই. দার্শনিক সিস্টেমের উপর নির্ভর করে, একটি আত্মা হয় নশ্বর বা অমর হতে পারে । [107]

প্রাচীন গ্রীকরা জীবিত থাকার ধারণার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য " ensouled " শব্দটি ব্যবহার করত , যা ইঙ্গিত করে যে প্রাচীনতম জীবিত পশ্চিমা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস করত যে আত্মা হল যা দেহকে জীবন দেয়। [108] আত্মাকে অসম্পূর্ণ বা আধ্যাত্মিক "শ্বাস" হিসাবে বিবেচনা করা হত যা জীবন্ত জীবকে সজীব করে (ল্যাটিন *অ্যানিমা* থেকে, cf. "প্রাণী")। ফ্রান্সিস এম. কর্নফোর্ড পিন্ডারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় থাকা অবস্থায় আত্মা ঘুমায়, কিন্তু যখন কেউ ঘুমিয়ে থাকে, তখন আত্মা সক্রিয় থাকে এবং স্বপ্নে "আনন্দ বা দুঃখের পুরস্কার কাছাকাছি" প্রকাশ করে। [109] এরউইন রোহডে লিখেছেন যে প্রাক-পূর্ব -পিথাগোরিয়ান বিশ্বাস আত্মাকে নিষ্প্রাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছিল যখন এটি দেহ ছেড়ে চলে যায় এবং এটি দেহে ফিরে আসার কোন আশা ছাড়াই হেডিসে অবসর নেয়। [110] প্রাচীনকালে প্লেটো ছিলেন প্রথম চিন্তাবিদ যিনি আত্মার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে একটি সুসংগত ধারণায় একত্রিত করেন: আত্মা হল যা বস্তুকে (অর্থাৎ, যা জীবন দেয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে জীবন স্ব-গতি)। তার চিন্তার, এটি একটি প্রবর্তক এবং একটি চিন্তাবিদ উভয়ই হতে হবে। [111]

98 "*মৃত্যু ও মৃত্যুর এনসাইক্লোপিডিয়া (*2008)" *।* deathreference.com. 5 *নভেম্বর* 2011 *তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত*13 *নভেম্বর*2011 .

107 "*আত্মা (বিশেষ্য)" । অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান* (*অনলাইন সংস্করণ)। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস । সংগৃহীত*1 *ডিসেম্বর* 2016 . (সাবস্ক্রিপশন বা অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ প্রয়োজন।)

111 ক্যাম্পবেল, ডগলাস (2021)। "সেল্ফ-মোশন অ্যান্ড কগনিশন: প্লেটোর থিওরি অফ দ্য সোল"। *দর্শনের দক্ষিণী জার্নাল*।**59**: 523-544 ।[১]

বিজ্ঞান

আত্মার অনুসন্ধান মানবদেহের শারীরস্থান এবং শারীরবৃত্তির বোঝার জন্য বিশেষভাবে কার্ডিওভাসকুলার এবং নিউরোলজির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয়।[139]আত্মার দুটি প্রভাবশালী বিরোধপূর্ণ ধারণার মধ্যে - একটি এটিকে আধ্যাত্মিক এবং অমর হিসাবে দেখে এবং অন্যটি এটিকে বস্তুগত এবং নশ্বর বলে দেখে, উভয়ই আত্মাকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্গে অবস্থিত বা সমগ্র জুড়ে বিস্তৃত হিসাবে বর্ণনা করেছে। শরীর[139]

পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ শন এম. ক্যারল লিখেছেন যে আত্মার ধারণা কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বের (কিউএফটি) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি লিখেছেন যে, একটি আত্মার অস্তিত্বের জন্য,

"[n]শুধুমাত্র নতুন পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন নেই, কিন্তু নাটকীয়ভাবে নতুন পদার্থবিদ্যা: QFT-এর মধ্যে, 'আত্মা কণা' এবং 'আত্মা শক্তি'-এর একটি নতুন সংগ্রহ থাকতে পারে না যা আমাদের নিয়মিত পরমাণুর সাথে যোগাযোগ করে, কারণ আমরা সেগুলি সনাক্ত করতে পারতাম। বিদ্যমান পরীক্ষায়।"[152]

সম্ভাব্য আত্মা/মস্তিষ্কের মিথস্ক্রিয়া জন্য একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া হিসাবে কোয়ান্টাম অনির্দিষ্টতাবাদকে আহ্বান করা হয়েছে। স্নায়ুবিজ্ঞানী পিটার ক্লার্ক এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় ভূমিকা পালন করে এমন কোন প্রমাণ নেই; ক্লার্ক উপসংহারে পৌঁছেছেন যে একটি কার্টেসিয়ান আত্মার কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার কোন ভিত্তি নেই।[153][মি]

139 Santoro, G; *উড, এমডি; মেরলো, এল; আনাস্তাসি, জিপি; টমাসেলো, এফ;* Germanò, A (*অক্টোবর* 2009) *। "হৃদয় থেকে আত্মার শারীরবৃত্তীয় অবস্থান, মস্তিষ্কের মাধ্যমে, পুরো শরীরে এবং তার বাইরে: পশ্চিমা ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মাধ্যমে একটি যাত্রা" ।নিউরোসার্জারি ।***65**(4): 633–43, *আলোচনা* 643.doi:10.1227/01.NEU.0000349750.22332.6A *।পিএমআইডি*19834368 *।*S2CID27566267 *।*

152 Carroll, Sean (23 May 2011). "Physics and the immortality of the soul". preposterousuniverse.com (blog). Retrieved 21 March 2024.

153 ^ Jump up to:[a] [b] Clarke, Peter G.H. (21 November 2013). "Neuroscience, quantum indeterminism and the Cartesian soul". Brain and Cognition. **84** (1): 109–117. doi:10.1016/j.bandc.2013.11.008. ISSN 0278-2626. PMID 24355546. Retrieved 21 March 2024

প্যারাসাইকোলজি

কিছু প্যারাসাইকোলজিস্ট , বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, মস্তিষ্ক থেকে পৃথক একটি আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন , যেমনটি সাধারণত ধর্মে মানসিক বা মনের সমার্থক শব্দ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মিলবোর্ন ক্রিস্টোফার (1979) এবং মেরি রোচ (2010) যুক্তি দিয়েছেন যে প্যারাসাইকোলজিস্টদের কোনো প্রচেষ্টাই এখনও সফল হয়নি। [154] [155]

আত্মার ওজন

1901 সালে, ডানকান ম্যাকডুগাল একটি পরীক্ষা (" 21 গ্রাম পরীক্ষা ") পরিচালনা করেছিলেন যেখানে তিনি রোগীদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের ওজন-পরিমাপ করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে মৃত্যুর সময় বিভিন্ন পরিমাণে ওজন হ্রাস ছিল; তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে আত্মার ওজন 21 গ্রাম একটি একক রোগীর পরিমাপের উপর ভিত্তি করে, পরস্পরবিরোধী ফলাফল বাদ দিয়ে। [156] [157] পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট এল. পার্ক লিখেছেন যে ম্যাকডুগালের পরীক্ষাগুলি "আজকে কোন বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয় না", এবং মনোবিজ্ঞানী ব্রুস হুড লিখেছেন যে "কারণ ওজন হ্রাস নির্ভরযোগ্য বা প্রতিলিপিযোগ্য ছিল না, তার ফলাফলগুলি অবৈজ্ঞানিক ছিল। " [158] [159]

154 Milbourne Christopher. (1979). Search for the Soul: An Insider's Report on the Continuing Quest by Psychics and Scientists for Evidence of Life After Death. Thomas Y. Crowell, Publishers.
155 ^ Mary Roach. (2010). Spook: Science Tackles the Afterlife. Canongate Books Ltd. ISBN 978-1-84767-080-9
156 ^ MacDougall, Duncan (1907). "The Soul: Hypothesis Concerning Soul Substance Together with Experimental Evidence of the Existence of Such Substance". American Medicine. New Series. **2**: 240–43.
157 ^ "How much does the soul weights?". Live Science. December 2012. Archived from the original on 28 April 2016.
158 ^ Park, Robert L. (2009). Superstition: Belief in the Age of Science. Princeton University Press. p. 90. ISBN 978-0-691-13355-3
159 ^ Hood, Bruce. (2009). Supersense: From Superstition to Religion – The Brain Science of Belief. Constable. p. 165. ISBN 978-1-84901-030-6

কুরআন ও হাদিসের আলোকে রুহ বা আত্মা এবং তার পবিত্রতা

রুহ বা আত্মা

হযরত আমাশ (রা), মুগীরা ইবনে ইবরাহীম (রা) থেকে তিনি আলকামা (রা) থেকে আর তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের একটি জামাআতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর সাথী ছিলেন। তখন ইয়াহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি একটু চুপ থাকলেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, যেন ওহী নাযিল হচ্ছে। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হলো-

“এবং তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ বৈ আর কিছু নয়। এই বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮৫)।

আল কুরআনের বিশটি সূরার বাইশটি আয়াতে মোট চব্বিশবার 'রূহ' শব্দটি এসেছে। প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, পূর্বাপর সম্পর্ক ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে রূহ শব্দটির অর্থ ও মর্ম ভিন্ন ভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, এসকল বিস্তৃত আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার বা সারাংশ হচ্ছে এই যে, রূহ শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে পাঁচভাবে করা হয়েছে।(রুহ কি এবং কেমন, ইমাম গাযযালি (র), ৯০)

পবিত্র কুরআনে ‘রূহ' শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এক. রূহের অর্থ ওহী। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, “ওয়া কাযালিকা আওহাইনা ইলাইকা রূহাম মিন আমরিনা।” অর্থাৎ “আর এমনিভাবে আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি। আমার আদেশক্রমে।” (সূরা শূরা : আয়াত-৫২)

আরো ইরশাদ হয়েছে— ইউলকির রূহা মিন আমরিহি আলা মাইয়াশাউমি ইবাদিহি। অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ।” (সূরা মুমিন ঃ আয়াত-১৫)

ওহীকে রূহ বলা হয়, কেননা এর দ্বারা রূহ ও কালব জীবনীশক্তি লাভ করে ।

দুই. রূহের অর্থ শক্তি, স্থায়িত্ব ও সহায়তা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, উলায়িকা কাতাবা ফী কুলূবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহিম মিনহু। অর্থাৎ “তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহের দ্বারা।” (সূরা মুজাদালা ঃ আয়াত-২২)

তিন. রূহের অর্থ জিরাঈল (আ)। যেমন ইরশাদ হয়েছে, নাযালা বিহির রূহুল আমীনু আলা কালবিকা। অর্থাৎ “বিশ্বস্ত ফেরেশতা অর্থাৎ জিবরাঈল এটাকে নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার কালবে।” (সূরা শুআরা : আয়াত-১৯৩-১৯৪) আরো ইরশাদ হয়েছে- মান কানা আদুওয়াল লি জিবরীলা ফাইন্নাহু নাযযালাহু আলা কালবিকা বিইযনিল্লাহ। অর্থাৎ “আপনি বলে দিন, জিবরাঈলের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে তার জেনে রাখা দরকার, জিবরাঈল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এই কুরআন আপনার কালবে নাযিল করেছেন।” (সূরা আল-বাকারাহ : আয়াত-৯৭) আরো ইরশাদ হয়েছে- কুল নাযযালাহু রূহুল কুদুসি মিররাব্বিকা। অর্থাৎ “আপনি বলুন, আপনার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবেই রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন নিয়ে এসেছেন।” (সূরা নাহল : আয়াত-১০২)

চার. ঐ রূহ যার সম্পর্কে ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলো। উত্তরে বলা হয়েছিলো- এটি হলো আমার রবের আদেশ থেকে একটি মাখলূক । এটি ঐ রূহ যার সম্পর্কে নিম্নের দু'টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াওমা ইয়াকূমুর রূহু ওয়াল মালায়িকাতু সাফফান। অর্থাৎ "যেদিন রূহ -ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।" (সূরা নাবা : আয়াত-৩৮) তানাযযালুলল মালায়িকাতু ওয়ার রূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম। অর্থাৎ "ফেরেশতাগণ ও রূহ এ রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।" (সূরা কদর ঃ আয়াত-৪)

পাঁচ. রূহের অর্থ হযরত ঈসা (আ)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ইন্নামাল মাসীহু ঈসা ইবনু মারইয়ামা রাসূলুল্লাহি ওয়া কালিমাতুহু আলকাহা ইলা মারইয়ামা ওয়া রূহুম মিনহু। অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ ছিলেন আল্লাহর এক রাসূল এবং তাঁর একটি কালিমাহ, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরই (আল্লাহর) নিকট থেকে আগত একটি রূহ।" (সূরা নিসা : আয়াত-১৭১)

পবিত্র কুরআনে মানুষের রূহের অর্থে 'নাফস' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে— ইয়া আইউহাতুন্নাফসুল মুতমায়িন্নাহ। অর্থাৎ "হে প্রশান্ত আত্মা।" (সূরা আল ফাজর : আয়াত-২৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে— ওয়া লা উকসিমু বিন্নাফাসিল্লাউয়ামাহ। অর্থাৎ "আরো শপথ করছি সেই মনের, যে নিজেকে খুব তিরস্কার করে।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-২)

ইরশাদ হয়েছে— ইন্নান্নাফসা লা আম্মারাতুম বিসসুয়ি। অর্থাৎ "নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩)

ইরশাদ হয়েছে— আখরি আনফুসাকুম। অর্থাৎ "বের করো স্বীয় আত্মা।" (সূরা আল আনআম : আয়াত-৯৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে- ওয়া নাফসিওঁ ওয়ামা সাওয়াহা, ফা আলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা । অর্থাৎ "শপথ আত্মার এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, , অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (সরা আশ-শামস : আয়াত ৭-৮)

কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত। অর্থাৎ "প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৮৫)

হাদীস শরীফে মানুষের রূহ সম্পর্কে 'নাফস' শব্দটির উল্লেখ আছে। এছাড়া রূহের অর্থ বুঝানোর জন্য রূহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

রূহ সম্পর্কে ইমাম রাযী (র)-এর ছয়টি অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো । তিনি বলেন, মানুষ যদি কোন বিশেষ ধরনের দেহ বিশিষ্ট হয়, যা এই প্রকাশ্য দেহের ভেতরে লুকায়িত আছে, তাহলে এই অভিমত সমর্থনকারীগণ এই দেহ নিয়েও বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন।

এক. এক শ্রেণীর লোকের মতে দেহ বলতে এর চারটি উপাদানের সংমিশ্রণকে বুঝায়।

দুই. অন্য এক শ্রেণীর লোকের মতে এই দেহ হলো রক্ত ।

তিন. অন্য এক শ্রেণীর লোকের মতে এই দেহ হলো, একটি সূক্ষ্ম রূহ যেটা হৃৎপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়ে ধমনীর মাধ্যমে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

চার. অন্য একটি মতে এই দেহ হলো রূহ যা হৃৎপিণ্ডে সৃষ্টি হয়ে মস্তকে পৌঁছে যায় । এটাই মানুষের স্মৃতিশক্তি, এরই সাহায্যে মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা করে থাকে।

পাঁচ. আরেকটি মত হলো, এই দেহ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডিত অংশ।

ছয়. অপর আরেকটির মতে নাফস এটি সত্তা যা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গত দেহ থেকে পৃথক এবং একটি ঊর্ধ্বলোকের নূরানী সূক্ষ্ম দেহ যেটা জীবন্ত ও সচল। এছাড়া একটি মৌলিক পদার্থ যা লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যেমন, গোলাপের মধ্যে নির্যাস, জলপাইয়ের মধ্যে তৈল আর কয়লার মধ্যে আগুন মিশে থাকে, সে পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম সত্তা দেহের মধ্যে সচল ও সক্রিয় থাকে । আর এভাবেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও কল্যাণ কার্যকর হয়ে থাকে। তবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে রূহ কলুষিত হয়ে যায়, তখন রূহের ঐসব শক্তি গ্রহণ করার যোগ্যতা লোপ পেয়ে যায়। রূহ তখনই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রূহানী জগতে চলে যায় ।

গ্রন্থকারের মতে ইমাম রাযী (র)-এর এই ষষ্ঠ অভিমতটিই কেবল গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল। এছাড়া অন্য কোন অভিমত তাঁর মতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম রাযী (র)-এর এই অভিমতের সমর্থনে কুরআন, হাদীস, সাহাবাদের ইজমা বা ঐকমত্য, যুক্তি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকার এই অভিমতের স্বপক্ষে শতাধিক প্রমান এখানে উপস্থাপন করেছেন।আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্ মানুষের রূহ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময় আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার রূহকে ছাড়েন না, তবে অন্যান্যদের (রূহকে) ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।” (সূরা আয-যুমার : আয়াত-৪২)

এই আয়াতের মধ্যে ষষ্ঠ অভিমতের পক্ষে তিনটি প্রমাণ রয়েছে। তাহলো- ১. রূহকে উপরে উঠানো, ২. রূহকে আটক করা হয়, ৩. এক পর্যায়ে রূহকে ছেড়ে দেয়া হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, “আফসোস, যদি আপনি প্রত্যক্ষ করতেন, যখন যালিম মৃত্যুর কষ্টের মধ্যে থাকে, আর ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে বলেন, নিজের প্রাণ বের করো । আজকে তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।” (সূরা আনআম : আয়াত-৯৩)

এখানে রূহের চারটি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ১. রূহকে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের আগমন, ২. রূহকে দেহ থেকে বের করা, ৩. রূহের বের হয়ে আসা, ৪. ঐসময় রূহের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হওয়া এবং মহান রবের সামনে রূহের উপস্থিত হওয়া । পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, “তিনিই রাতে তোমাদের রূহ কবয করেন, আর তিনি জানেন যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর। তারপর তিনি তোমাদেরকে (দ্বিতীয়) দিনে সেই কর্মজগতে ফিরিয়ে পাঠান, যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে।”

“এমনকি যখন তোমাদের মধ্যে থেকে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তার প্রতি প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেন। আর তাঁরা নিজেদের কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন না।” (সূরা আল আনআম : আয়াত ৬০-৬১)

এই আয়াতগুলোর মধ্যে রূহের অবস্থা সম্পর্কে তিনটি প্রমাণ রয়েছে ঃ (৮) রূহকে নিদ্রাবস্থায় উঠিয়ে নেয়া হয়। (৯) রূহকে আবার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, (১০) মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা রূহকে কবয করেন ।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : “হে প্রশান্ত চিত্ত, তোমার রবের দিকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাও এ অবস্থায় যে, তুমি সন্তুষ্ট এবং তোমার রবের নিকট প্রিয়পাত্র। আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।” (সূরা আল ফাজর : আয়াত ২৭-৩০)

এই পবিত্র আয়াতগুলোতে রূহের তিনটি প্রমাণ রয়েছে- ১১. রূহের ফিরে আসা, ১২. রূহের প্রবেশ করা, ১৩. রূহের সন্তুষ্ট হওয়া ।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, “আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।” আগেকার দিনের মনীষীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ ছিলো, এসব কথা মৃত্যুর সময়, কেয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশের সময়, না এ উভয় স্থানেই বলা হবে। একটি মারফূ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)- কে একবার বলেছিলেন, “এসব কথা ফেরেশতারা তোমাকে তোমার ইনতেকালের সময় বলবেন।” হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেছেন, রূহকে তিনটি স্থানে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়া হবে। মৃত্যুর

সময়, হাশরের দিন ও কেয়ামতের দিন হযরত আবূ সালিহ (রা) বলেছেন, "একজন নেককার বান্দাকে তাঁর ইনতেকালের সময় আমার বান্দাদের সাথে মিলিত হও" এই শুভ সংবাদ দেয়া হয় বেহেশতে প্রবেশের শুভ সংবাদ দেয়া হবে কেয়ামতের দিন।"

মানুষের দেহের সাথে রূহের তিন প্রকার সম্পর্ক রয়েছে :
প্রথমটি হলো— 'রূহে মুকিম' বা স্থায়ী রূহ। এটাই আসল রূহ। এই রূহ দেহ থেকে বিদায় নিলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গতিশক্তি ও অনুভব শক্তি চিরতরে রহিত হয়ে যায়।
দ্বিতীয় প্রকার রূহ হলো- 'রূহে জার' বা প্রতিবেশীসুলভ রূহ। এর অপর নাম 'রওয়া'। এই রূহ দেহ থেকে চলে গেলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, আবার ফিরে আসলে জেগে উঠে। এই রূহ মানুষের দু'চোখের মাঝখানে অবস্থান করে।
তৃতীয় প্রকার রূহ হলো— 'রূহে আমীন'। এটা সব সময় মানব দেহে অবস্থান করে । এমনকি মৃত্যুর পরেও এই রূহ দেহে বা কবরে থেকে যায়। কারো কারো মতে, মুনকার ও নাকীরের সওয়াল-জওয়াব এই রূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। (তথ্যসূত্র : তাহযীবুস সালাত) –অনুবাদক

নাফস ও রূহ কি এক, না ভিন্ন

অধিকাংশ জ্ঞানী লোকের মতে নাফস ও রূহ একই। কারো কারো মতে এ দু'টো আলাদা ও পৃথক। নাফস শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এক. জাওহারীর মতে, নাফসের অর্থ হলো রূহ। যেমন- আরবিতে বলা হয়, 'খারাজাৎ নাফসুহু' অর্থাৎ তার রূহ বের হয়ে গেছে। দুই. রক্তকেও নাফস বলা হয়, যেমন- আরবিতে বলা হয়, 'সায়ালাৎ নাফসুহু' অর্থাৎ তার রক্ত বয়ে গেছে। হাদীস শরীফে আছে, "মালা নাফসুন লাহু সায়েলাতুন লা ইয়ানজুমুল মাউ ইয়া মাতা ফীহে। অর্থাৎ 'যার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই তা যদি পানিতে মারা যায়, তাহলে পানি নাপাক হবে না।" তিন. জিসম বা দেহ। জনৈক আরবদেশীয় কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"আমাকে বলা হয়েছে, বনী তামীম নিজের পুত্রদেরকে মুনযেরের দেহের রক্তে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।" চার. বদ নযর অর্থাৎ নাফসুল আইন। আরবিতে বলা হয় "আসাবাৎ ফলানান আয়-আইন" অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির বদ নযর লেগেছে। কিন্তু এখানে নাফসের অর্থ হবে রূহ। কেননা দৃষ্টির মাধ্যমে রূহ নিজের তাছীর বা প্রতিক্রিয়া কার্যকর করে থাকে । এই জন্য বলা হয়ে থাকে অমুকের নযর লেগেছে। যার অর্থ হলো– বদ রূহের নযর পড়েছে। পাঁচ. নাফসের অর্থ কোন মানুষ বা ব্যক্তিকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনে ব্যক্তির অর্থে 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- "স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে। আর কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলূম করা হবে না।" (সূরা আন-নাহল ঃ আয়াত-৩৮) "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ হবে।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ আয়াত-৩৮) নাফস শব্দটি রূহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত আত্মা!" (সূরা ফজর : আয়াত-২৭)

"এবং আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছিলো।" (সূরা নাযিয়াত ঃ আয়াত-৪০) "নাফস তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।" (সরা ইউসুফ : আয়াত-৫৩)

নাফস ও রূহ

অধিকাংশ জ্ঞানী লোকের মতে নাফস ও রূহ একই। কারো কারো মতে এ দু'টো আলাদা ও পৃথক। নাফস শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে।

এক. জাওহারীর মতে, নাফসের অর্থ হলো রূহ। যেমন- আরবিতে বলা হয়, 'খারাজাৎ নাফসুহু' অর্থাৎ তার রূহ বের হয়ে গেছে।

দুই. রক্তকেও নাফস বলা হয়, যেমন- আরবিতে বলা হয়, 'সায়ালাৎ নাফসুহু' অর্থাৎ তার রক্ত বয়ে গেছে। হাদীস শরীফে আছে, "মালা নাফসুন লাহু সায়েলাতুন লা ইয়ানজুমুল মাউ ইয়া মাতা ফীহে। অর্থাৎ 'যার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই তা যদি পানিতে মারা যায়, তাহলে পানি নাপাক হবে না।"

তিন. জিসম বা দেহ। জনৈক আরবদেশীয় কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমাকে বলা হয়েছে, বনী তামীম নিজের পুত্রদেরকে মুনযেরের দেহের রক্তে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।” চার. বদ নযর অর্থাৎ নাফসুল আইন। আরবিতে বলা হয় “আসাবাৎ ফলানান আয়-আইন” অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির বদ নযর লেগেছে। কিন্তু এখানে নাফসের অর্থ হবে রূহ। কেননা দৃষ্টির মাধ্যমে রূহ নিজের তাছীর বা প্রতিক্রিয়া কার্যকর করে থাকে । এই জন্য বলা হয়ে থাকে অমুকের নযর লেগেছে। যার অর্থ হলো— বদ রূহের নযর পড়েছে।

পাঁচ. নাফসের অর্থ কোন মানুষ বা ব্যক্তিকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনে ব্যক্তির অর্থে ‘নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- “স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে। আর কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলূম করা হবে না।” (সূরা আন-নাহল : আয়াত-৩৮) “প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ হবে।” (সূরা মুদ্দাসসির ঃ আয়াত-৩৮) নাফস শব্দটি রূহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “হে প্রশান্ত আত্মা!” (সূরা ফজর ঃ আয়াত-২৭) “এবং আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছিলো ।” (সূরা নাযিয়াত ঃ আয়াত-৪০) “নাফস তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।” (সুরা ইউসুফ : আয়াত-৫৩)

রূহের প্রয়োগ শুধু দেহের জন্য হয় না। আবার রূহ ও দেহের উভয়ের জন্যও হয় না। পবিত্র কুরআনে রূহের একাধিক অর্থের উল্লেখ রয়েছে। ১. রূহ শব্দের অর্থ হুকুম বা নির্দেশ । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, “এবং এমনিভাবেই আমি আপনার নিকট আমার নির্দেশে একটি রূহ প্রেরণ করেছি।” (সূরা শূরা ঃ আয়াত-৫২) “তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা নিজের নির্দেশে ওহী প্রেরণ করেন, যেন সে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।” (সূরা মু'মিন : আয়াত-১৫) ২. রূহ শব্দের অর্থ ওহী। আল্লাহ তা আলা হরশাদ করেছেন, “াতান ফেরেশতাদেরকে ওহী সহকারে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি তাঁর ইচ্ছা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নেই। সুতরাং আমাকে ভয় কর।” (সূরা নাহল : আয়াত-২)

ওহীকে রূহ বলা হয় কেন? ওহীকে এই জন্য রূহ বলা হয়, এর দ্বারা উপকারী জীবন লাভ করা যায় । ওহী ব্যতিরেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে না। পরিণতির দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে পশুর জীবন নিরাপদ ।

রূহকে রূহ বলার কারণ কি? রূহকে এই জন্য রূহ বলা হয় যে, এর উপর জীবন নির্ভর করে। আরবি ভাষায় বাতাসকে 'রীহ' বলা হয়। কারণ এর দ্বারা জীবন রক্ষা পায়।

রূহ শব্দের বহুবচন হলো আরওয়াহ । যেমন একটি আরবি কবিতায় উল্লেখ আছে, "ইয়া হাব্বাতিল আরওয়াহু মি নাহবে আরদিকুম, ওয়াজাদতু লিমাসরিহা আলাকাবাদি বারাদ।" অর্থাৎ "যখন তোমাদের যমীনের দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন এর দ্বারা আমি নিজের কলিজায় শান্তি অনুভব করি।" তাই আরবি ভাষায় রূহকে রূহ, রায়হান ও ইসতিরাহাত বলা হয় ।

নাফসকে রূহ বলার কারণ হলো, এর দ্বারা জীবন রক্ষিত ও অর্জিত হয়। 'নাফস' শব্দটি 'নাফিস' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এই শব্দের অর্থ হলো, "নাফাসাত ও শরাফত" অর্থাৎ পবিত্রতা ও মর্যাদা। নাফসকে নাফস বলার আরেকটি কারণ হলো, আরবি 'তানাফস' শব্দের অর্থ শ্বাসগ্রহণ করা ও শ্বাস বের হওয়া। তাই 'তানাফফুস' শব্দ থেকে এটি উৎপত্তি হয়েছে। এছাড়া দেহে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে আসা যাওয়া করার কারণে একে নাফস বলা হয়। এর থেকেই 'নাফাসুন' (শ্বাস বিরতি) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। নিদ্রার সময় মানুষের রূহ সাময়িকভাবে বের হয়ে যায়, জাগ্রত অবস্থায় আবার ফিরে আসে, মৃত্যুর সময় একেবারেই বের হয়ে যায়, কবরে সওয়ালের সময় আবার ফিরে আসে, সওয়াল-জবাবের পর আবার বের হয়ে যায়। হাশরের দিন আবার রূহ দেহে ফিরে আসবে ।

নাফস ও রূহের মধ্যে পার্থক্য কি? এদের মধ্যে পার্থক্য হলো গুণগত, সত্তাগত নয় । রক্তকে নাফস বলার কারণ কি? রক্তকে এই জন্য নাফস বলা হয়, অধিক পরিমাণ রক্ত দেহ থেকে বের হয়ে গেলে মৃত্যু ঘটে । এই অবস্থায় নাফসের দেহ থেকে বের হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং নাফসের ন্যায় জীবনও রক্ত নির্ভর। যেমন বলা হয়- "তাসীলু আলা হাদিযাবাতি নুফুসানা ওয়া লাইসাৎ আলা গায়রি যাবাতি তাসীলু।" অর্থাৎ "তরবারীর ধারের উপর আমাদের রক্ত প্রবাহিত হয়। "আর তা না হলে রক্ত প্রবাহিত হয় না।" বলা হয়ে থাকে- "ফাদাতনাফসুহ, খারাজাত নাফসুহু, ফারাকাত নাফসুহু" আরবি 'ফয়েয' শব্দের দ্বারা কোন কিছু প্রবাহিত হওয়াকে বুঝায় । আর ইফাদাহ বলতে দ্রুত ও অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে বুঝায় । ইফাদাহ বলতে ইচ্ছাধান বুঝায় আর ফয়েয শব্দের দ্বারা বাধ্যবাধকতা বুঝায় । আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মানুষের মৃত্যুর সময় রূহ বের হয়ে যায়। মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও সুফীদের এ শ্রেণীর অভিমত হলো- রূহ ও নাফসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে ।

রূহ ও নাফস সম্পর্কে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান (র)-এর অভিমত হলো এই যে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন রূহ ও নাফসের। নিদ্রার সময় মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন নাফস বের হয়ে যায়। তবে দেহের সঙ্গে নাফসের যোগাযোগ থেকে যায়। একটি লম্বা আলোকরশ্মির মতো কোন কোন সময় নিদ্রিত ব্যক্তি তার নাফসের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখে থাকে । তবে জীবনী শক্তি ও রূহ তার দেহে বিদ্যমান থাকে যার সাহায্যে নিদ্রিত ব্যক্তি পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। লোকটি জাগ্রত হয়ে গেলে চোখের পলকের চেয়েও অধিক দ্রুতগতিতে তার নাফস দেহে ফিরে আসে। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে নিদ্রার মধ্যে মৃত্যু দান করতে চান, তখন তার বের হয়ে যাওয়া নাফসকে আটকে দেন। উল্লেখ্য যে, নিদ্রিত অবস্থায় নাফস বের হয়ে উপরের দিকে যায়, আর স্বপ্ন দেখার সময় ফিরে আসে । এভাবে নিদ্রাভঙ্গের পর তার স্বপ্নের সব কথা মনে পড়ে। আর সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিদ্রিত মানুষের রূহকে জানিয়ে দেয়া হয় ।

রূহ ও নাফস সম্পর্কে ইবনে মান্দা (র)-এর অভিমত হলো। রূহ ও নাফস কি- এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, নাফস হলো মাটি ও আগুনে মিশ্রিত, রূহ হলো নূর ও রূহানিয়াতের দ্বারা ঘটিত। আরেকটি অভিমত এই যে, রূহ হলো ঐশী আর নাফস হলো পার্থিব সত্তা। নাফসের দ্বারা মানুষের ভালো-মন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। হাদীসবেত্তাগণ বলেন যে, রূহ ও নাফসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নাফসের জীবন নির্ভর করে রূহের উপর আর নাফস হলো মানুষের একটি সুরত বা আকৃতি। এটা আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, লোভ-লালসার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্য নাফসের চেয়ে বড় শত্রু আর কিছু নেই। নাফস শুধু দুনিয়ার মোহমায়ায় আকৃষ্ট। অপরপক্ষে, রূহ মানুষকে আখিরাতের দিকে উদ্বুদ্ধ করে ও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। আর শয়তানকে নাফস ও লালসার অধীন করে দেয়া হয়েছে। ফেরেশতাদের রূহ ও জ্ঞানের সাথে মানুষের রূহের সম্পর্ক আছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস বান্দাদের ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন সময় সাহায্য করে থাকেন।

(রূহের রহস্য: ৩৪৬)

নাফস কি একটি না তিনটি

অনেকের মতে মানুষের নাফস তিনটি। এক. নাফসে মুতমায়িন্নাহ। দুই. নাফসে আম্মারাহ। তিন. নাফসে লাউয়ামাহ। প্রত্যেক মানুষের উপর কোন না কোন নাফস প্রাধান্য লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "হে প্রশান্ত চিত্ত!" (সূরা ফাজর : আয়াত-২৭)

"আমি নাফসে লাউয়ামাহর শপথ করছি।" (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত-২)

"অবশ্য নাফস তো মন্দের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা ইউসুফ : আয়াত -৫৩) প্রকৃতপক্ষে, নাফস মাত্র একটি, কিন্তু তার গুণবাচক নাম তিনটি। তবে নাফসে মুতমায়িন্নাহ এজন্য বলা হয়েছে যে, সে তার রবের ইবাদত, মুহাব্বত, তাওবাহ, ইনাবত বা আনুগত্য, নির্ভরশীলতা ও সন্তুষ্টির দ্বারা স্থির ও প্রশান্ত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও মুহাব্বত এবং ভয় ও আশা আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন হলো, অন্যের মহাব্বত ও সন্তুষ্টি, ভয় ও আশা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা, যেন মানুষ তার রবের মুহাব্বতে ডুবে অন্যের মুহাব্বত থেকে বিমুখ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ বা যিকরকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে স্মরণ করে না, আর আল্লাহর দীদার লাভের আশায় বিভোর থাকে এবং অন্য কারো সাক্ষাৎ কামনা করে না, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির অন্তরে মেনে আসে প্রশান্তি আর আল্লাহ তা'আলার মারফতে সেই ব্যক্তি থাকে সুদৃঢ়। মানুষের এই পলায়নপর মনকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে আনেন যেন তাঁরা আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত আছে । এই মারেফাতের দ্বারাই তারা সবকিছু দেখে ও শুনে । এই প্রশান্তি বান্দার কালব ও নাফসের মধ্যে এবং সারাদেহে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেটা বান্দার রূহকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আকর্ষণ করে, আর তার দেহের প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে নিয়োজিত করে । রূহের সত্যিকারের প্রশান্তি আল্লাহ তা'আলার যিকরের বা কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- "ঈমানদারদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার যিকরের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকর সেই জিনিস যার দ্বারা অন্তর শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে ।" (সূরা রা'দ : আয়াত-২৮)

ইতমীনানে কালব অন্তরের শান্তিকে বলা হয়, এর দ্বারা মনের অস্থিরতা, দুঃখ- যাতনা দূরীভূত হয়ে যায়। এই নিআমতটি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হলো ঈমানী ইতমীনান বা বিশ্বাসজনিত প্রশান্তি। অপরটি হলো ইহসানী ইতমীনান। **(রূহের রহস্য: ৩৪৭)**

যাবতীয় লোভ-লালসামুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে মনে শান্তি লাভ করা। তাছাড়া নিজের ইচ্ছাকে অথবা কারো অনুসরণকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের উপর প্রাধান্য না দেয়া। যেসব বিষয়ের সাথে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সঙ্গে সংঘাত বাধে এমন কোন কাজে লিপ্ত ও সম্পৃক্ত না হওয়া। এমন কোন বাসনা পোষণ না করা যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের পরিপন্থি। বরং এ জাতীয় কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে সেটাকে সে শয়তানী প্ররোচনা বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "এটা হলো খাঁটি ঈমান।" এরূপ ঈমানের চিহ্ন হলো গুনাহের দরুন বিচলিত হওয়া ও পেরেশানী থেকে দূরে সরে এসে তাওবাহ করে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ করা। এ বিষয়ে চিন্তা করলে এটা বুঝা যায় যে, এই শান্তি ও তৃপ্তি তাওবার কারণেই অর্জিত হয়েছে। যিনি এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন। গুনাহের যে অশান্তি সেটা তাওবার মাধ্যমে দূরীভূত হয় । কোন গুনাহগার ব্যক্তি যদি তার গুনাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তার মধ্যে যে ভয়-ভীতি, চঞ্চলতা, অস্থিরতা এবং পেরেশানী আছে তা সে উপলব্ধি করতে পারে, যদিও লোভ-লালসা, অলসতা, কাম-ক্রোধ তাকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। প্রত্যেক লোভ-লালসার এক প্রকার নেশা আছে, যা মাদকদ্রব্যের নেশার চেয়েও অধিক প্রবল। এমনিভাবে ক্রোধের নেশা শরাবের নেশার চেয়েও মারাত্মক। এজন্য একজন প্রেমিক ও ক্রোধান্বিত মানুষ এমন সব কাজ করে বসে যা একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিও করে না। এমনিভাবে একজন গুনাহগার ব্যক্তি অলসতা, উদাসীনতা এবং অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানের প্রশান্তির দিকে, আল্লাহর যিকরের তৃপ্তির দিকে এবং আল্লাহর মুহাব্বত ও মারেফাতের দিকে এসে যায়। এসব প্রক্রিয়ায় রূহের কখনো শান্তি লাভ হয় না। অন্যথায় রূহ সীমাহীন অস্থিরতা ও দুর্ভোগের শিকার হয়। এভাবে একজন মানুষ বিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও অলসতা থেকে মুক্ত হয়ে যায় ।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গকে একটি বিশেষ গুণ প্রদান করেছেন। মানুষের যদি ঐসব গুণ না থাকতো, তাহলে সে সমূহ অশান্তি ও অস্থিরতায় ভুগতো। যেমন- চোখের গুণ হলো দর্শন করা, কানের গুণ হলো শ্রবণ করা আর মুখের গুণ হলো কথা বলা। যখন এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি লোপ পায়, তখন মানুষ গভীর দুঃখ ও বেদনা ভোগ করে। কোন একজন মানুষ যদি আল্লাহর এসব নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার জীবন অসার, অচল ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। সারা দুনিয়া তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে থাকুক না কেন এবং দুনিয়ার সকল বিদ্যায় সে সুপণ্ডিত হোক না কেন। কাজেই যে পর্যন্ত না আল্লাহ

তা'আলা সে ব্যক্তির নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং তার মা'বুদ হবেন, সে পর্যন্ত সে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবে না। একজন বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদত- বন্দেগী অপরিহার্য।
(৩৪৮ ও রূহের রহস্য)

নাফসে মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত আত্মা

প্রশান্ত আত্মা কাকে বলে? এ সম্পর্কে তাফসীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "প্রশান্ত আত্মা হলো সত্য ও মাহবুবিয়াতের স্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী রূহ।" হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, " মুমিন ব্যক্তি যার দিল আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত । " হযরত হাসান (রা) বলেন, "ঐ রূহ যে আল্লাহ তা'আলার বাণীকে সত্য বলে স্বীকার করে।" হযরত মুজাহিদ (রা) বলেন, "ঐ রূহ যে আল্লাহ যে তার রব বা প্রতিপালক সেটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সামনে অবনত হয়।" হযরত মানসূর (র) বলেন, "আল্লাহর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন করে আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হজয়, সেটাই প্রশান্ত আত্মা।" হযরত ইবনে নাজীহ (র) বলেন, "আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে অবনত এবং তাঁর সাক্ষাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী রূহ হলো প্রশান্ত আত্মা।" তাছাড়া ইবাদত ও আমলের দ্বারা রূহ প্রশান্তি লাভ করে ।
নাফসে মুতমায়িন্নাহ সম্পর্কে পূর্বেকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে দু'টি মূলনীতিকে সমর্থন করতেন, সেগুলো হলো ইলম ও ঈমান। একজন মানুষ সন্দেহ থেকে বিশ্বাসের দিকে, মূর্খতা থেকে ইলমের দিকে, আল্লাহর বিস্মৃতি থেকে যিকরের দিকে, গুনাহ থেকে তাওবাহর দিকে, লোক দেখানো ইবাদত থেকে ইখলাসের দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে, উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে শৃঙ্খলার দিকে এবং আমলহীনতা থেকে আমলের দিকে অগ্রসর হলে রূহের প্রশান্তি লাভ হয় এসব সতর্ক বাণীর মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে আমরা ঈমান ও আমল ঠিক রেখে জীবনকে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারি। আখিরাতের জীনব সম্পর্কে যার কোন চিন্তা- ভাবনা নেই, আর আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ সম্পর্কে উদাসীন, সে ব্যক্তির অবস্থা হলো একজন নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, না, এর চেয়েও তার অবস্থা আরো শোচনীয় ও জঘন্য।

একজন নেককার জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকেন। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করতে তার মনের অলসতা ও অনীহা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ হতভাগ্য ব্যক্তি লোভ-লালসার তাড়নায় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকে ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা তাকে অতি সহজেই পথভ্রষ্ট করে দেয়। তার অবস্থা একজন নেশাগ্রস্থ লোকের ন্যায়। সৌভাগ্যবশত যদি এই অবস্থায় কোন হাক্কানী আলিমের উপদেশ ও সাবধান বাণী তার মনে রেখাপাত করে আর তার সে অলসতা দূর করে দেয়, তাহলে সে তার অন্তর্নিহিত সপ্রবৃত্তির কারণে সম্বিত ফিরে পায় এবং বলে উঠে, হে প্রভু! আমি হাযির। এভাবেই অর্জিত হয় তার সে সাহস ও শক্তি, যার ফলে সে আল্লাহর নাম ও মাহাত্ম্য সমুন্নত করে এবং সুদৃশ্য জান্নাতীমহলসমূহ দেখতে পায়। (রূহের রহস্য * ৩৪৯)
কাজও সে দেখতে পায়। আর আল্লাহর দরবারে এই প্রাথনা জানায় "হে আমার বে! তোমার নিআমত অফুরন্ত, আমার গুনাহে আমি অনুতপ্ত এবং আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আমার কানই পুণ্য নেই। কল্যাণ ও সৌভাগ্যের আমি উপযুক্ত নই। তবে আমি তোমার হেমতের আশাবাদী ও ক্ষমাপ্রার্থী।"
এ ধারণা ও বিশ্বাসের দ্বারা বান্দা দু'টি বিরাট উপকার লাভ করে। তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিআমত বৃদ্ধি পায় ও সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে বান্দা আরেকটি আলো দেখতে পায়, যার সাহায্যে তার নিজ সময়ের মূল্য বুঝতে পারে যে এটাই তার সৌভাগ্য লাভের উপায়। এইভাবে যাবতীয় গুনাহ হতে তাওবাহ করে একজন লোক যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর পথে আসে, তখন সে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ও সাবধান হয়ে যায়। অর্থাৎ সে সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখে এবং দিনের শেষে এই চিন্তা করে যে তার দিনটি কিভাবে অতিবাহিত হলো? একজন মানুষ এভাবেই গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।
এই অবস্থায় বান্দা তার সকল জাগতিক কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জা বোধ করে যে, সে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহমায়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এই উপলব্ধিই নাফসে মুতমায়িন্নাহর প্রথম স্তর, যেখান থেকে একজন খাঁটি বান্দা আল্লাহর পথে যাত্র শুরু করে।

নাফসে লাউয়ামাহ

এখানে নাফসে লাউয়ামাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নাফসে লাউয়ামাহর কসম করেছেন, ইরশাদ হয়েছে, "ওয়া লা উকসিমু বিন্নাফসিল লাউয়ামাহ।" অর্থাৎ "আমি আরও শপথ করছি সেই তিরস্কারকারী ঘনের।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-২)

নাফসে লাউয়ামাহ কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। একশ্রেণীর লোকের মতে নাফসে লাউয়ামাহ এক অবস্থার উপর স্থির থাকেনা। আরবি 'লাউয়ামাহ' শব্দটি 'তাম' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ হলো তারাদ্দুদ বা ইতস্তত করা। নাফসে লাউয়ামাহ আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিদর্শন এবং তাঁর একটি মাখলুক বা সৃষ্টি, যেটা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। কখনো আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, আবার কখনো অলস হয়ে যায়, কখনো আল্লাহ তা'আলার দকে অগ্রসর হয়, আবার কখনো পেছনে সরে পড়ে। কখনো হালকা হয় আবার কখনো থেমে যায়। কখনো সৎকাজ পছন্দ করে, আবার কখনো অপছন্দ করে। কখনো সে আনন্দিত হয়, আবার কখনো নিরানন্দে ভোগে। কখনো সন্তুষ্ট হয়, আবার কখনো অসন্তুষ্ট হয়। কখনো ভালোকাজ করে, আবার কখনো মন্দ কাজ করে। মোটকথা, প্রতি মুহূর্তে নাফসে লাউয়ামাহ তার কর্যক্রম পরিবর্তন করে। (রূহের রহস্য* ৩৫১)

নাফসে লাউয়ামাহ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (র)-এর অভিমত হলো, একজন মুমিন বান্দা সর্বদা নিজের নাফসকে এই মর্মে তিরস্কার করে যে, একটি মন্দ কাজ সে কেন করলো, এই কাজটি না করে সে অন্য একটি নেক কাজ করলো না কেন? কারো কারো মতে মুমিনের নাফসকে নাফসে লাউয়ামাহ বলা হয়, যে নাফস একজন মুমিনকে পাপে লিপ্ত করে, আবার এই জন্য তাকে তিরস্কার করে। অবশ্য এই তিরস্কার করাটা ঈমানের একটি লক্ষণ। কেননা বদবখত বা দুর্ভাগা ব্যক্তির নাফস শুনাহের জন্য তিরস্কার করে না বরং গুনাহ না করার জন্য তাকে তিরস্কার করে।

অন্য একশ্রেণীর জ্ঞানী লোকের মতে নাফসে লাউয়ামাহ কাফির ও মুমিন উভয়ের নাফসকেই বলা হয়। একজন মুমিন বান্দা কোন গুনাহে জড়িত হওয়ার দরুন ও আল্লাহর আনুগত্য পরিহার করার কারণে নাফস তাকে তিরস্কার করে। আর একজন বেঈমান ব্যক্তিকে এই নাফস ঈমানদার ও সৎ না হওয়ার জন্য তিরস্কার করে।

অপর একশ্রেণীর আলিমের মতে নাফসে লাউয়ামাহর এই তিরস্কার কিয়ামতের দিন কার্যকর করা হবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির নাফস তাকে তিরস্কার করবে। সে ব্যক্তি মন্দ হলে মন্দের জন্য আর সৎ হলে আরো ভালো আমল না করার জন্য তিরস্কার করবে। উপরোক্ত সবগুলো অভিমতই সঠিক। এসবের মধ্যে কোন প্রকার সংঘাত বা সন্দেহ নেই। কেননা নাফস এসব গুণে গুণান্বিত। এজন্যই এই নাফসকে নাফসে লাউয়ামাহ বলা হয়। নাফসে লাউয়ামাহ দু'প্রকার। এক. লাউয়ামাহ মালুমাহ অর্থাৎ মূর্খ ও অত্যাচারী নাফস, যাকে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতারা ভর্ৎসনা করেন। দুই. লাউয়ামাহ গায়র মামাহ। এটি হলো ঐ নাফস যেসব সময় নিজ দেহের আমলের ক্রটির জন্য তাকে তিরস্কার করে। অবশ্য সামর্থ্য অনুযায়ী সে নেককাজ করার চেষ্টা করে থাকে।

সবচেয়ে উত্তম নাফস হলো ঐ নাফস যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ক্রটির জন্য ও তার অপরাধের জন্য লজ্জাবোধ করে। আল্লাহ তা'আলার সন্তোষজনক কাজের জন্য লোকেরা তাকে মন্দকথা বললে সে সেটা নীরবে সহ্য করে। আর এসব বিষয় সম্পর্কে কোন গুরুত্ব দেয়না। নিশ্চয় এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করে। পক্ষান্তরে, কেউ তাকে অবহেলা করলে সে ব্যক্তির (৩৫২ঃ রূহের রহস্য) নিজের আমলের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। কেউ তার দোষক্রটি অন্বেষণ করলে তার নাফস তা সহ্য করেনা। অন্য কেউ তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে সে নির্বিকার থাকে না। এরূপ লোক আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়।

নাফসে আম্মারাহ

নাফসে আম্মারাহ হলো খারাপ নাফস। সে প্রত্যেক মন্দকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে । এটাই হলো তার সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু যাকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করেন তাকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং সাহায্য করেন, সে নাফসে আম্মাহর চক্রান্ত থেকে রক্ষা পায়। কোন মানুষ তার নাফসের কু-প্ররোচনা থেকে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া রক্ষা পেতে

পারে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "আমি নিজের নাফসকে নির্দোষ মনে করি না। নিশ্চয় মানুষের নাফস অপকর্মের দিকে অধিক উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু যাকে আমার রব রহম করেন।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো পাক ও পবিত্র হতে পারতো না।" (সূরা নূর : আয়াত-২১)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত বান্দা ও রাসূল সম্পর্কে বলেছেন, "আমি যদি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম, তাহলে আপনি তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়তেন। (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-৭৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা বা ভাষণের প্রাথমিক বাক্যগুলোর অর্থ লক্ষণীয়, "আল্লাহ তা'আলার শোকর ও তারীফ। আমরা তাঁর শোকর করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে মাফ চাই এবং আমাদের মনের দৌরাত্ম্য ও কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর আশ্রয় চাই। আর আমাদের মন্দকাজ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না, আর আল্লাহ তা'আলা যাকে গুমরাহীতে রাখেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না।

নাফসের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে, তাই নাফস মন্দ আমল করিয়ে দেয় । আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বান্দাকে তার নাফসের কাছে ছেড়ে দেন, তাহলে সেই বান্দা নাফসের দৌরাত্ম্য ও মন্দ আমলের দরুন ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দান করেন ও সাহায্য করেন, তাহলে সে রক্ষা পেতে পারে। আসুন, আমরাও মহান মা'বুদের কাছে দুআ করি- "হে আমাদের রব, আমাদেরকে নাফসের দৌরাত্ম্য থেকে ও মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।"

আল্লাহ তা'আলা নাফসে আম্মারাহ ও লাউয়ামাহ দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন । আর নাফসে মুতমায়িন্নাহ দ্বারা সম্মান বর্ধন করেন। আসলে, নাফস একটাই ।**(রূহের রহস্য ঃ ৩৫৩)**

তবে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- আম্মারাহ, লাউয়ামাহ ও মুতমায়িন্নাহ। প্রকৃতপক্ষে, ইতমীনান বা প্রশান্তি হলো নাফসের চরম পরিপূর্ণতা ও সাবধানতা । আল্লাহ তা'আলা নাফসে মুতমায়িন্নাহকে তাঁর সহযোগী শক্তির দ্বারা সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি প্রত্যক নাফসের জন্য একজন ফেরেশতা সঙ্গী করে দিয়েছেন, যিনি সবসময় তার সঙ্গে থাকেন।

তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন, তাকে সৎ, সত্য ও ন্যায় পথে চলতে উৎসাহিত করেন। আর নেক আমলের সুন্দর ও মনোরম আকৃতি তাকে দেখান। মন্দ লোককে তার মন্দ আমলের জন্য তিরস্কার করেন, তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন, আর তার খারাপ আমলের খারাপ আকৃতি তাকে দেখান। আর নেক বান্দাকে কুরআন তিলাওয়াত, যিকর আযকার ও নেকআমলের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকেন। সবদিক থেকে নেকীর প্রহরা ও আল্লাহর তাওফীক তার নসীব হয়। আর এসব নেককাজ ও ভালো আমলের শোকর আদায়ের জন্য তার সাহস ও শক্তি বাড়তে থাকে । তখন সে দৃঢ়তার সাথে নাফসের মুকাবিলা করতে পারে। একজন বান্দার মূল শক্তি হলো তার ঈমান ও ইয়াকীন। সে নাফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈমানী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। ঈমানের শাখা প্রশাখা হলো- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, ওয়ায-নসীহত, লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আর যে সবের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলো হলো- ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তাওবাহ, আত্মসমালোচনা, সবর ইত্যাদি। এছাড়া নেক বান্দার দিলে আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সীমাহীন ইশক মুহাব্বত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পালনের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সুন্দর চরিত্র, সততা ইত্যাদি গুণাবলী একজন নেকবান্দার জন্য অপরিহার্য। একজন খাঁটি ও সত্যবাদী ব্যক্তি এই সরল পথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না এবং সতর্কতার সাথে সে সামনে অগ্রসর হয়। কিন্তু শয়তান সততা ও নিষ্ঠাবর্জিত ব্যক্তিকে সরল পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তাই এই ব্যক্তি উদাসীন, ভ্রান্ত ও মাতালের ন্যায় হয়ে যায়, সে কোন সৎ আমল করুক বা না করুক। বরং তার উদাসীনতা তাকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে নেকপথে অগ্রসর হয়, সে নাফসে মুতমায়িন্নাহ অর্জনকারীদের দলভুক্ত হয়ে যায়।

নাফসে আম্মারার সাথী হলো শয়তান, যে তার কাছে মিথ্যা অঙ্গীকার করে, মিথ্যা আশার বাণী শোনায় এবং তাকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয় আর অসৎ কাজের দিকে প্ররোচিত করে, মন্দ কাজগুলোকে সুন্দর আকৃতিতে উপস্থাপন করে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখায়। মিথ্যা বিষয়গুলোকে অতিসুন্দর আকৃতিতে দেখা যাতে মানুষ বিনা দ্বিধায় সেটা গ্রহণ করে এবং সেদিকে আকৃষ্ট হয়। এছাড়া শয়তান ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকা দিতে সচেষ্ট থাকে। সে মানুষের অন্তরে মিথ্যা আশা (৩৫৪* রূহের রহস্য) জাগিয়ে তোলে, ক্ষতিকর লালসায় লিপ্ত করে। একজন শয়তানরূপী মানুষও জানে কাউকে মন্দকাজে প্ররোচিত করার জন্য লোভ-লালসার কোন বিকল্প নেই। অবশেষে শয়তান তার প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস খুঁজে বের

করে, আর সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে ঐগুলোকে অনুসরণ করার জন্য প্রলুব্ধ করে ও তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। তারপর যখন নাফস লোভ-লালসার দরজা খুলে দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করে চরম হৈ চৈ ও অশান্তির সৃষ্টি করে, হত্যা ও লুটতরাজ চালায় । এভাবে শয়তান মানুষের ঈমান, তিলাওয়াতে কুরআন এবং যিকর আযকার ও নামাযের কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়, মসজিদেকে ধ্বংস করে, গীর্জা ও অগ্নিকুণ্ডকে আবাদ করে। আর মদখোর এবং জুয়াড়ীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এভাবে আল্লার কর্তৃত্বকে বিনষ্ট করতে চায় আর মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে সরিয়ে খোদাদ্রোহী ও মূর্তিপূজারী বানিয়ে ছাড়ে। আর আনুগত্যের ইয্যত থেকে বের করে পাপের স্তূপে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী শ্রবণ করা থেকে অশ্লীল গান-বাজনা শোনার দিকে প্ররোচিত করে। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়ার আশা দূর করে শয়তানের অনুচরদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। পরিণামে যে ব্যক্তি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখতো, এখন সমূহ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত ছিলো সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় । আসলে, নাফসে মুতমায়িন্নাহর সাথী হলো ফেরেশতা, আর নাফসে আম্মারাহর সাথী হলো শয়তান । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মানুষের নিকট ফেরেশতা ও শয়তান উভয়েই আগমন করে।" এভাবেই ভালো- মন্দ খেয়াল মানুষকে প্রভাবিত করে। শয়তানী খেয়াল মানুষকে মন্দকাজের দিকে, আর নেক খেয়াল মানুষকে ভালোকাজে উৎসাহ দান করে। তবে যার দিলে নেকখেয়াল আসে তাকে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা উচিত। আর দৃঢ়বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এসেছে। পক্ষান্তরে, বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া উচিত। তারপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উপস্থিত সকলকে তিলাওয়াত করে শুনালেন, যার অর্থ হলো, "শয়তান একদিকে তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, আর অন্যদিকে তোমাদেরকে লজ্জাহীনতার উৎসাহ দেয়।" (সূরা আল-বাকারাহ : আয়াত-২৬৮)

নাফসে মুতমায়িন্নাহ ও নাফসে আম্মারাহর মধ্যে যে সংঘর্ষ ও সংঘাত দেখা দেয় সে সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো। ফেরেশতা ও ঈমানের প্রহরীগণ নাফসে মুতমায়িন্নাহর সাহায্যে তাওহীদ, ইহসান, সবর, তাওয়াক্কুল, তাওবাহ, নেকী, তাকওয়া, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহ, একাগ্রতা ইত্যাদির মাধ্যমে (রূহের রহস্য ঃ ৩৫৫) মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর শয়তান ও তার বাহিনী নাফসে আম্মারাহর

সাহায্যে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। এভাবে প্রত্যেক ভালো জিনিসের দিকে শয়তানকে লেলিয়ে দেয়া হয়। শয়তান নাফসে আম্মারাহকে তার প্রতিনিধি বানাতে চায়, যাতে নাফসে আম্মারাহ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এজন্য শয়তান নাফসে মুতমায়িন্নাহ থেকে নেক আমল ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সর্বদা সক্রিয় থাকে।

শয়তান ও নাফসে আম্মারাহ থেকে নেক আমলকে রক্ষা করা বান্দার জন্য একটি কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। বান্দার আমলসমূহ যথারীতি আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে যায়। একটি নেক আমলও যদি সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে যায় তাহলে তা হবে ঐ ব্যক্তির নাজাতের কারণ । কিন্তু শয়তান ও নাফসে আম্মারাহ বান্দার একটি নেক আমলও পরিশুদ্ধভাবে যাতে আল্লাহর নিকট পৌঁছতে না পারে সে বিষয়ে তৎপর ও সক্রিয় থাকে। একজন আরিফ অর্থাৎ আল্লাহ প্রেমিকের বক্তব্যের অর্থ এই যে, "আমি যদি জানতে পারি, আমার একটি নেক আমল যথারীতি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌঁছে গিয়েছে তাহলে সেটা হবে আমার জন্য ঐ মুসাফিরের থেকেও বেশি আনন্দদায়ক, যে দীর্ঘ সফরের পর নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছে।"

এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বক্তব্য হলো, যদি আমি জানতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে একটি সিজদা গ্রহণ করেছেন, তাহলে সেটা হবে আমার নিকট দীর্ঘ প্রবাসের পর বাড়ি ফিরে আসা মুসাফিরের চেয়েও অধিকতর প্রিয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের মানতই কবূল করে থাকেন।" (সূরা মায়িদাহ : আয়াত-২৭) নাফসে আম্মারাহ নাফসে মুতমায়িন্নাহর সম্মুখে অবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । নাফসে মুতমায়িন্নাহ যদি কোন ভালোকাজ করে, তখন নাফসে আম্মারাহ তার বিরোধিতা করে আর তাকে মন্দকাজের দিকে উৎসাহিত করে, যেন এতে তার নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। নাফসে মুতমায়িল্লাহ ঈমান, তাওহীদ ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলে নাফসে আম্মারাহ তার পরিবর্তে সন্দেহ, নিফাক, শিরক এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভালোবাসা, গায়রুল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করে। নাফসে মুতমায়িন্নাহ কোন বান্দাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন নাফসে আম্মারাহ খারাপ ও মন্দকাজের প্রতি আল্লাহ-রাসূলের হুকুমের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় । নেকলোকদেরকে ভ্রান্ত প্ররোচনায় খারাপ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এভাবে জনগণের নেক ধ্যান-ধারণাকে নষ্ট করে। তাই নাফসে মুতমায়িল্লাহ ও নাফসে আম্মারাহর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আল্লাহ তা'আলা যাকে

সাহায্য করেন সেই রক্ষা (৩৫৬ রুহের রহস্য) পায়। ঐ ব্যক্তি যখন পরিশুদ্ধ আমল, আল্লাহর আনুগত্য, তাওবাহ, সত্যবাদিতা ও নাফসের কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সৎকর্মে নিয়োজিত হয়, তখন নাফসে আম্মারাহ এসবের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং এক মুহূর্তে তার কাজ সমাধা করতে চায়। এছাড়া নাফসে আম্মারাহ মানুষকে বিশ্বাস করাবার জন্য আল্লাহর শপথ করে বলে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী ছাড়া আর কিছু নই। অথচ এটা একেবারেই নিরেট ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিভ্রান্ত করা। আল্লাহর কসম, এসবই হচ্ছে নাফসে আম্মারাহর প্রতারণা যাতে সুন্নাতের অনুসরণ থেকে নেককার বান্দা বিরত থাকে ও লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে নাফসে আম্মারাহর দুনিয়াতে ও বরযখে এবং আখিরাতে সংকীর্ণ স্থানে বন্দী অবস্থায় থাকবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নাফসে আম্মারাহ নেকবান্দাদের সুস্থ মন ও মগজকে পঙ্গু করে দেয়। আর যেসব কাজ উত্তম ও সম্মানজনক এবং উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন সেগুলোকে কুৎসতি আকৃতিতে উপস্থাপন করে। অবুঝ ও দুগ্ধপোষ্য শিশুরাই সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তারা ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। তারা যখন বালিগ হয়, তখন ভালোমন্দের পার্থক্য করতে পারে, আর ক্ষতিকর বিষয়সমূহ থেকে দূরে থেকে ভালো বিষয়গুলো গ্রহণ করে, ভালো কাজগুলোকে ত্যাগ করতে পছন্দ করেনা। নাফসে আম্মারাহর প্রকৃতস্বরূপ হলো, খাঁটি তাওহীদকে সে খারাপ ও অপছন্দনীয় আকৃতিতে দেখাতে পছন্দ করে, এর দ্বারা মহৎ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এভাবে নেক বান্দাদেরকে তাঁদের উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়। আর হীনতা, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের আবর্তে ঠেলে দেয়। এরূপ অবস্থায় বিভ্রান্তিতে নিপতিত নেক বান্দাদের কোন কার্যকর ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা অনুমতি ছাড়া কোন সুপারিশ করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না । এই মায়াবী নাফসে আম্মারাহ এ বিষয়গুলোকে মহৎ ব্যক্তিবর্গের কাছে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্যের সহিত প্রদর্শন করে, যে কারণে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। এভাবে তাঁদেরকে মিসকীনও ফকীর বানিয়ে দেয়া হয়, এটা নেককার বান্দাদের সাথে ঘৃণ্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে চাকচিক্যময় কথার ফাঁদে পড়ে মানুষ খাঁটি তাওহীদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে। পবিত্র কুরআন শরীফে তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তারা বলে, “সেকি তার সব মা'বূদকে ত্যাগ করে শুধু একজন মাত্র মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে। এটাতো বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার।” (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-৫)

নাফসে আম্মারাহর অনুসারীরা এমনিভাবে খাঁটি ইত্তেবায়ে রাসূলকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। নাফসে আম্মারাহর যারা শিকার সেসব মুশরিক ও বাতিলপন্থীরা যারা খাঁটি ও ঈমানদার ও সৎলোক তাঁদের সম্পর্কে বলে, তারা আলিমদের (রূহের রহস্য + ৩৫৭)। মর্যাদাকে হ্রাস করে, ইমামগণের মূল্যবান মতামতকে উপেক্ষা করে, তাঁরা তো কুরআন হাদীসের আলোকে মতামত সাব্যস্ত করে থাকবেন। তাঁরা তো এদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের সাথে বেআদবী করতে কি এদের লজ্জা হয় না? ছোট মুখে বড় কথা কি শোভা পায়? মহৎ বক্তিবর্গের সম্মুখে বড় বড় কথা বলে। আলিমদের শানে কু-ধারণা পোষণ করে। তারা তাদের ভ্রান্ত ভণ্ড নেতাদের বক্তব্যকে সঠিক ও অনুসরণীয় বলে মনে করে, পক্ষান্তরে, পূত-পবিত্র রাসূলের হাদীসগুলোকে আপত্তিকর মনে করে এবং এসব হাদীসকে তাদের মনগড়া বক্তব্য অনুযায়ী অর্থ করার চেষ্টা করে, কোন হাদীস যদি তাদের মতের সাথে খাপ খায়, তাহলে তা গ্রহণ করে, অন্যথায় তা বর্জন করে। কিম্বা অলীক ও অবাস্তুর অর্থ গ্রহণ করে যে এগুলো আমাদের উপলব্ধি করার আওতার বাইরে। নাফসে আম্মারাহ শপথ করে জনসাধারণকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মানুষের কল্যাণ সাধন ও সকলের সাথে আপোষ করা। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এদের অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। নাফসে আম্মারাহ মানুষের পরিশুদ্ধ ইবাদতকে ঘৃণার উদ্রেককারী রঙে উপস্থাপন করে। কেউ যদি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ইবাদত বন্দেগী করে, তাহলে সাধারণ মানুষ সেটাকে বেশি পছন্দ করেনা এবং তাকে এড়িয়ে চলে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম করে এবং নানা মন্দ ফিকিরের আশ্রয় নেয়, তাহলে তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় এবং তাকে পছন্দ করে। আসলে, আমাদের উচিত ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা, লোক দেখানোর জন্য নয়। নাফসে আম্মারাহ এভাবেই ধোঁকা দিয়ে থাকে।

যাঁরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, আর যারা আল্লাহর অবাধ্য, নাফসে আম্মারাহ তাদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করে। এ সংঘাত বা জিহাদকে নাফসে আম্মারাহ নেককার লোকদেরকে এ বলে বুঝাতে চায় যে, এতে তারা অন্যের বিরূপ সমালোচনার পাত্র হবে। অর্থাৎ তারা যেন এরূপ কোন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। এছাড়া নাফসে আম্মারাহ একজন নেককার বান্দাকে এ ধারণাও দেয় যে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করলে দুঃখ-কষ্ট ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। নাফসে আম্মারাহ জিহাদ সম্পর্কে আরো ধোঁকা দেয় যে, এতে করে মানুষ মৃত্যুবরণ করে, যার ফলে তাদের সন্তান-সন্ততি ইয়াতীম ও

অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের স্ত্রীগণও দুঃখকষ্টে পতিত হয়, তাদের ধনসম্পদও বিনষ্ট হয়ে যায় ।

নাফসে আম্মারাহ নেককার বান্দাদেরকে যাকাত ও সাদকাহ সম্পর্কে একইভাবে ধোঁকা দেয়, যাকাত ও সাদকাহ আদায় করলে তারা কপর্দকহীন ও গরীব হয়ে পড়বে এবং অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও উলামায়ে ইযাম নাফসে আম্মারাহর চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাওয়ার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নাফসে আম্মারাহ ও শয়তান সকল অন্যায় কাজের মূল হোতা এবং এরা একযোগে কাজ করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "যখন কুরআন পাঠ শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নেবে।' (সূরা নাহল : আয়াত-৯৮)

"শয়তান যদি তোমাকে কখনো উসকানী দেয়, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও, তিনি সব শুনেন, সব জানেন।" (সূরা আরাফ : আয়াত-২০০)

"বলুন, হে রব! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের উপস্থিতি থেকে।" (সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ৯৭-৯৮)

"বলুন, আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টার নিকট সেসব প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং গিরায় ফুঁকদানকারী (বা ফুঁকদানকারিণী) এর অনিষ্ট থেকে, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।" (সূরা ফালাক)

"বলুন, আমি পানাহ চাই মানুষের রব, মানুষের প্রভু, মানুষের প্রকৃত মা'বূদের নিকট, বারবার ফিরে আসা ওয়াসওয়াসা উদ্রেককারীর অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কু-প্রবৃত্তির উদ্রেক করে সে জিনের মধ্য থেকে হোক, কি মানুষের মধ্য থেকে।" (সূরা নাস)

নাফসে আম্মারাহ ও তার সাথী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একজন বান্দাকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া অপরিহার্য। শয়তান হলো নাফসে আম্মারাহর এক নিকৃষ্ট সাথী। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমার সর্বব্যাপী ও কামিল রাবুবিয়াত বা প্রভুত্বের কাছে শয়তান ও নাফসে আম্মারার চক্রান্ত, প্রতারণা (রূহের রহস্য ঃ৩৬১) এবং ফাসাদ থেকে তোমরা আশ্রয় চাও। এই দু'টি দুশমনের মধ্যবর্তী স্থান হলো দিল বা অন্তর। এ

দু'টির প্ররোচনা অনবরত মানুষের অন্তরের দরজায় আঘাত করে এবং সব সময় আসা যাওয়া করে। এই ভয়ঙ্কর প্ররোচনার মূল উপাদান হলো লোভ-লালসা, হিংসা, যুলুম, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ, আর এসব নাফসে আম্মারাহর মাধ্যমে ঘটে থাকে এবং মানুষের অন্তরকে বিভ্রান্ত করে । তারপর ধূর্ত শয়তান একজন ক্ষতিকর চিকিৎসকের রূপ ধরে রুগ্ন ব্যক্তির কাছে আসে, অর্থাৎ তার রোগের চিকিৎসা করার বাহানায় তাকে বিপথগামী করে এবং তার ফন্দিফিকিরের মারফত তার মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে, এটাই হলো তার রোগমুক্তির অমোঘ পন্থা। অর্থাৎ মানুষ এভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে। এভাবে অন্তরের দুর্বলতাজনিত রোগের কারণে নাফসে আম্মারাহর শক্তির সাথে শয়তানের শক্তি মিলিত হয়ে একযোগে প্রতারণা চালিয়ে যায়। একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এভাবেই শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর দ্বারা প্রভাবান্বিত ও প্রতারিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে লোভ-লালসা তাকে মন্দকাজে উৎসাহিত করে। শয়তান ও নাফসে আম্মারাহর প্ররোচনার ফলে একজন বিপথগামী ব্যক্তি সাময়িক আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে । তার খারাপ কাজ যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ঈমান ও আমল সে রক্ষা করতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দান করেন, সাহায্য করেন ও রহমতের দ্বারা অনুগৃহীত করেন এবং তার হিফাযত করেন, তার অন্তরচক্ষু খুলে দেন। তখন সে ব্যক্তি নাফসে আম্মারাহ ও শয়তানের চক্রান্তের পরিণতি উপলব্ধি করতে পারে। এভাবে একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট লোকদের থেকে যতোশীঘ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, একজন লোক সমুদ্রের পানিতে অঙ্গুলি ডুবিয়ে তুললে যে পানিটুকু তার অংগুলিতে লেগে থাকে, চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন ঠিক তেমনি সামান্য । (রূহের রহস্য ঃ৩৬২, রূহের রহস্য :মূল (আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম) অনুবাদ: (লোকমান আহমদ আমীমী)

মানব দেহে রূহ কখন আগমণ করে এবং প্রকৃত রং ও জৈব রূহের সম্পর্ক

এ পর্যায়ে প্রকৃত রূহ যা আদেশ (কুন) (5)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জৈব রূহ যা দেহ কাঠামো ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উপাদানের সাথে

সংশ্লিষ্ট তার সম্পর্ক অনুধাবন করা একান্ত দরকার। মানুষের দেহ কাঠামো ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাদানগুলো যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন এর মাঝে এক প্রকার শক্তি কাজ করতে থাকে। বৃহত্তর কোনো এক শক্তির সংমিশ্রণ ছাড়া দেহ কাঠামো সঞ্জাত এই শক্তি থাকে নিষ্ক্রিয় ও মর্থহীন। এই নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন শক্তিকে জৈব রূহ বলা হয়।

আল-কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির শেষ স্তর এবং গ্রহ ও জীবন সৃষ্টি করার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে : "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। তারপর আমি একে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পারে, তারপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। (সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ১২-১৩-১৪ : পারা-১৮ : রুকু-১)। এই আয়াতের "অবশেষে একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে"

ثم انشئناه خلقا آخر

কথার মাঝে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, 'প্রকৃত রূহ' ফুঁৎকারের মাধ্যমে মানুষের একটা নতুন রূপ প্রদান করা হয়। কারণ মানব সৃষ্টির প্রথমোক্ত ছয়টি স্তর অর্থাৎ মাটির উপাদান, শুক্রবিন্দু, জমাট রক্ত পিণ্ড, অস্থি পঞ্জর, গোশতের আচ্ছাদন ইত্যাদি বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সপ্তম স্তর হচ্ছে এক অন্য জগত। অর্থাৎ 'প্রকৃত রূহ' দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর। এই স্তরে রূহ দেহে স্থানান্তরিত হলেই পরিপূর্ণ জীবন্ত মানুষের নতুন রূপ প্রকাশ পায়। উপরোক্ত আয়াতে 'অন্য ধরনের সৃষ্টি' (ট্রো মর্চি) শব্দের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রহঃ), হযরত শা'বী (রহঃ), হযরত ইকরামা (রাঃ), হযরত দাহহাক (রাঃ), হযরত আবুল আলীয়া (রাঃ) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো 'রূহ সঞ্চার' করা। তাফসীরে মাজহারীতে আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এই রূহ বলতে জৈব রূহকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট, যা জৈব দেহের সকল রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের দেহ

কাঠামোর ছয়টি স্তরবিন্যাস ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টির পর এই জৈব রূহের উদ্ভব ঘটে এবং এই জৈব রূহ-ই আসল 'রূহকে ধারণ করে পরিপূর্ণ এক নতুন সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেন। এর হেকমত ও বিশেষত্ব জানা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মহান রাব্বুল আলামীন এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং 'আলমে আরওয়াহ'-এর মাঝে এগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন। অনাদিকালে মহান রাব্বুল আলামীন এ সকল প্রকৃত রূহকে সমবেত করে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে হাঁ (4) বলে আল্লাহ পাকের রাবুবিয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে, এই 'প্রকৃত রূহের' সম্পর্ক মানবদেহের সাথে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টির পর স্থাপিত হয়। আর এখানে রূহ সঞ্চার দ্বারা যদি জৈব রূহের' সাথে 'প্রকৃত রূহের' সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তাহলে এটাও সম্ভবপর। কেননা, মানব জীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং জৈব রূহের সাথে । এর সম্পর্ক স্থাপিত হলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 'গেলে মানুষকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। এমনকি জৈব রূহ আর কাজ করতে পারে না। (রূহ কি এবং কেমন ১০২-১০৩)

আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার

যেমনিভাবে মানুষের বাহ্যিক দেহ কখনো সুস্থ থাকে কখনো রোগাক্রান্ত হয়। তদ্রূপ মানুষের আত্মাও (রূহও) কখনো সুস্থ থাকে, কখনো অসুস্থ হয়। যেরূপভাবে সর্দি, কাশি, জ্বর ও বিভিন্ন প্রকার ব্যাথা নামক মানুষের শারীরিক রোগ আছে, তদ্রূপ ক্রোধ, অহংকার, স্বার্থপরতা, আত্মশ্লাঘা, রিয়া (প্রদর্শনী ও লৌকিকতা) ইত্যাদি হলো রূহ বা আত্মার রোগ। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, এজন্য মানুষের উভয়বিধ জীবনের প্রতি ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে। ইসলাম যেরূপভাবে আমাদের বাহ্যিক দেহ ও শরীর সম্পর্কে কিছু হেদায়েত (দিক নির্দেশনা) দিয়েছে, তদ্রূপ আমাদের আধ্যাত্মিক ও গোপন জগত সম্পর্কেও কিছু হুকুম বাতলে দিয়েছে। যেমনিভাবে ইসলাম আমাদের বাহ্যিক জীবনে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি উত্তম আমলসমূহ আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে এবং কতিপয়

অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে তদ্রুপভাবে আমাদের গোপন তথা আধ্যাত্মিক জীবনকে কতিপয় উত্তম গুণ দ্বারা সুসজ্জিত করার এবং কতিপয় দুশ্চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে আত্মাকে পবিত্র রাখার হুকুমও দেয়।

ইসলামের যে সকল বিধানের সম্পর্ক আমাদের বাহ্যিক বা জাগাতক জীবনের সাথে, সেগুলো ফিকাহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আর যে সকল বিধান আমাদের আত্মার গোপন জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, তা ইলমে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয় ।

সুতরাং ইলমে তাছাওউফের আলোচ্য বিষয় হলো, আমাদের আত্মার ঐ জগত যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি দেখতে পায় না, কিন্তু ঐ গোপন জগতের সম্পর্ক আমাদের জাগতিক জীবনের সাথে খুবই মজবুত। এখন প্রশ্ন হলো, এ অন্তর বা দিল কি জিনিস? এ প্রশ্ন যদি ডাক্তার বা চিকিৎসককে করা হয়, তাহলে তারা এ উত্তর দিবে যে, অন্তর বলা হয় এমন একটি গোস্তের টুকরাকে যা মানুষের বক্ষের বাম পার্শ্বে ঝুলন্ত আছে এবং তার মাঝখানে কালো রঙ্গের জমাট রক্ত আছে। এই জমাট রক্তকে (বা আত্মার কৃষ্ণতা) বলা হয়। এ গোস্তের টুকরা যখন রক্তকে পাম্প করে বাহিরের দিকে নিক্ষেপ করে তখন এক প্রকার আওয়াজ হয়, এই আওয়াজকে হৃদয়স্পন্দন বলে। তদ্রুপভাবে ডাক্তারদের মতে রূহ ঐ বাষ্প বা স্ত্রীমকে বলে, যা কলবের (অন্তরের) মধ্যে রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়ে রক্তনালীর মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তাছাওউফের পরিভাষায় যে জিনিসকে অন্তর এবং রূহ বলে তা এই বাহ্যিক রূহ এবং অন্তর হতে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তাছাওউফের পরিভাষায় "অন্তর" এবং "রূহ" এমন দুটি সুক্ষ্ম শক্তিকে বলা হয়, যা মানুষের স্রষ্টা মানুষের এই বাহ্যিক অন্তর ও রূহের সাথেই সৃষ্টি করেছেন। (- আত্মশুদ্ধি ১৫-মুফতি মুহাম্মদ শফী)

যেমনিভাবে চোখ দেখার, কান শোনার এবং হাত ছোয়ার শক্তি রাখে, তেমনিভাবে জমাট রক্তের এ টুকরা, যাকে অন্তর বলা হয়- সে কামনা-বাসনার শক্তি রাখে। তাছাওউফের পরিভাষায় অন্তর ঐ শক্তির নাম, যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চাহিদা ও কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে থাকে ।

তাছাওউফ আমাদেরকে এতটুকু বলে যে, অন্তরের এ গোপন জগত, মানুষের বাহ্যিক জগতের ভিত্তি। এই গোপন জগতের উপরই মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। যদি অন্তরের এ জগত পরিশুদ্ধ হয় এবং এর ব্যবস্থাপনা ঠিকভাবে চলে, এ অন্তরে সঠিক কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়, সহীহ-শুদ্ধ চিন্তার উদ্রেক হয়, তাহলে মানুষটিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা হবে। আর যদি এ জগতের ব্যবস্থাপনায় ক্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে মানুষের

বাহ্যিক জগতের ব্যবস্থাপনাও ব্যাহত হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাস্তব কথাটিকেই আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب

অর্থাৎ, সাবধান! শরীরের মধ্যে এমন একটি গোস্তের টুকরা আছে, যদি এ গোস্তের টুকরাটি ভাল থাকে, তাহলে পূর্ণ শরীর ভাল থাকে। আর যদি এ গোস্তের টুকরাটি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাবধান! ঐ গোস্তের টুকরাটির নাম হলো, ক্বলব বা অন্তর। (সহীহ বুখারী ১:১৩ সহীহ মুসলিম ২ঃ২৮)

আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ শুধুমাত্র তার বাহ্যিক অবয়বের নাম নয়। বরং মানুষের আসল উপাদান হলো, তার অভ্যন্তর। যাকে কলব (অন্তর) এবং রূহ (আত্মা) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া বুখারী শরীফে বর্ণিত সহীহ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণিত করা হয়েছিলো যে, মানুষের বাহ্যিক আমল বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া এবং গঠন বা ধ্বংস হওয়াও এই অভ্যন্তরের গঠন ও ধ্বংসের উপর নির্ভরশীল।

দেহের বহির্ভাগ যেরূপভাবে কখনো সুস্থ থাকে, আবার কখনো অসুস্থ এবং শরীরের সুস্থতা ঠিক রাখার জন্য খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি উপকরণ অবলম্বন করা হয়, অসুস্থতা দূর করার জন্য ঔষধ-পত্র দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, তদ্রুপভাবে মানুষের অভ্যন্তর ভাগকে সুস্থ রাখার জন্য কিছু উপকরণ অবলম্বন করা হয়, আর তাহলো স্বীয় খালিক (স্রষ্টা) ও মালিককে চিনা, তাঁর যিকির ও শোকর করা এবং সর্বদা তাঁর হুকুমের অনুসরণ করা । আর অভ্যন্তর ভাগের অসুস্থতা হলো, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা এবং তাঁর হুকুমের খেলাফ (পরিপন্থী) কোন কাজ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

في قلوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرَضًا

অর্থাৎ, তাদের অন্তরে (কুফর ও অবাধ্যতার) রোগ আছে, সুতরাং আল্লাহপাক তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি করেছেন। (সূরা বাকারা, ১০ আয়াত)

আধ্যাত্মিক রোগ হলো- কুফর, শিরক, মুনাফিকী, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, গর্ব, লোভ, কৃপণতা, পদের মোহ, সম্পদের মোহ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। আর সুস্থতা হলো, স্বীয় মালিক আল্লাহপাককে চেনা, সকল লাভ ও ক্ষতি, সুখ ও দুঃখের মালিক আল্লাহপাককে মনে করা, তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা, যদি কোন বিপদ-আপদ আসে, তাহলে ধৈর্য ধারণ করা। সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করা এবং আযাবের ভয় করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ফিকির করা, আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে তাঁর সকল হুকুম পালন করা। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপকরণ হলো পবিত্র কুরআন। (- আত্মশুদ্ধি ১৬, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

আল্লাহপাক ইরশাদ করেনঃ

وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمِنِينَ

অর্থাৎ, আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য (রোগের) সু-চিকিৎসা এবং রহমত হয়। (সূরা বনী ইসরাঈল ৮২ আঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَا

অর্থাৎ, (হে নবী) আপনি বলে দিন, এই কুরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়েত এবং সুচিকিৎসা। (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪৪)

শারীরিক রোগ এবং আধ্যাত্মিক রোগের আরেকটি বড় পার্থক্য এই যে, শরীরের রোগতো চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। শিরার স্পন্দন, রক্ত ও মল-মূত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। বাহ্যিক বা শারীরিক রোগের চিকিৎসাও বিভিন্ন প্রকার অনুভবযোগ্য যন্ত্রপাতি ও ঔষধের মাধ্যমে করা হয়। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক রোগ চোখেও দেখা যায় না, শিরা ইত্যাদির স্পন্দন দ্বারাও তা

বুঝা যায় না। তদ্রূপ এ রোগের চিকিৎসাও অনুভবযোগ্য খাদ্য-পথ্য ও ঔষধের মাধ্যমে হয় না। আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত নিয়মের মাধ্যমেই হতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে মানুষের বাহ্যিক আমল, লেন-দেন এবং আভ্যন্তরীণ আক্বীদা এবং আখলাক সবকিছুই সংশোধনের পরিপূর্ণ নিয়মাবলী বিদ্যমান আছে ।

এ উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন হতে বর্তমান কালের কামেল বুযুর্গ পর্যন্ত, যার যা কিছু অর্জন হয়েছে, তা শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছের ঐ সকল নিয়মাবলীর উপর

পরিপূর্ণ পাবন্দির সাথে আমল করার দরুণই অর্জন হয়েছে। এ সকল বুযুর্গ যেরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমলের প্রতি যথাযথ যত্নবান ছিলেন, তদ্রুপ সত্যবাদীতা, আমলী ইখলাস, বিনয়, ধৈর্য, শোকর, তাওয়াক্কুল, দুনিয়া বিমুখতা ইত্যাদি রূহানী আমলের প্রতিও যত্নবান এবং কামেল ছিলেন। তাঁরা যেমন মিথ্যা, ধোঁকা, চুরি, বেহায়াপনা ইত্যাদি গোনাহকে ভয় করতেন এবং তা থেকে বিরত থাকতেন, তদ্রুপ অহংকার ও গর্ব, অপরকে অপমান ও হেয় প্রতিপন্ন করা, পদের মোহ ও সম্পদের মোহ, লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক রোগ এবং গোনাহকেও হারাম মনে করে তা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেন।

উলামায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত সকল বিধানকে কয়েকটি ইলম ও ফণরূপে (বিদ্যা ও বিষয়ে) পৃথকভাবে সংকলন করে দিয়েছেন। দৈহিক ও বাহ্যিক আমল তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক এবং সকল প্রকার লেন-দেন ও চুক্তিকে 'ইলমে ফিকাহ' রূপে। আর বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক আমলসমূহের মধ্য হতে আকাইদ'কে ইলমে আকাইদ' রূপে এবং আখলাক ও ইসলামী সামাজিক বিধি-বিধানকে 'ইলমে তাছাওউফ' রূপে সংকলিত করেছেন।

কোন কোন আলেম উপরোক্ত তিনটি ইলমকেই একত্রে সংকলন করেছেন। আল্লামা ইবনুস সুবকী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'জামউল জাওয়ামে' এর শেষাংশে (এটি উসূলে ফিকাহ্র বিখ্যাত কিতাব) তাছাওউফ, আখলাক তথা আভ্যন্তরীণ আমলের ব্যাখ্যা করেছেন।

(- আত্মশুদ্ধি ১৭-১৯, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

তাছাওউফের হাকীকত

বিগত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে ভেতর এবং বাহির তথা দেহ ও আত্মার সমষ্টির নাম। কুরআন ও হাদীছ শরীফে মানুষের সংশোধন ও সাফল্যের পরিপূর্ণ বিধানের যে কথা বলা হয়েছে, তার সম্পর্ক মানুষের দেহ এবং আত্মা উভয়ের সাথে। মানুষের সুবিধার জন্য বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আহকাম যেমন, ইবাদাত, বিবাহ, তালাক, লেন-দেন, চুক্তি-পত্র ইত্যাদিকে "ইলমে ফিকাহ' নামে সংকলিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষের অভ্যন্তর তথা আত্মা ও রূহের সাথে সম্পৃক্ত আহকামসমূহ যেমন,

আকাইদ ও আখলাককে 'ইলমে আকাইদ' ও 'ইলমে তাছাওউফ' নামে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংকলিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল কিছুই কুরআন ও হাদীছের শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন শাখা। এগুলোর প্রতিটিকে অপরটি থেকে পৃথক এ অর্থে বলা যায়, যেমন, হাত পৃথক অঙ্গ, পা পৃথক অঙ্গ, চোখ, কান, নাক, অন্তঃকরণ, কলিজা, পাকস্থলী ইত্যাদি পৃথক অঙ্গ। কিন্তু পূর্ণ মানব দেহ এ সবগুলোর সমন্বয়েই গঠিত । যেরূপভাবে এ সকল অঙ্গের কোন একটিকে নিয়ে আর অপরটিকে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না এবং এর কোনটিই অপর অঙ্গের বিরোধী নয়। একটির ক্রিয়া-কর্ম অপরটির ক্রিয়া-কর্মের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়, তদ্রুপভাবে ইলমে আকাইদ', 'ইলমে ফিক্হ', 'ইলমে তাছাওউফ' যদিও পৃথক পৃথক ইলম ও বিষয়, কিন্তু কেবলমাত্র এ সকল বিষয়ের প্রতিটির সমষ্টির উপর আমল করার দ্বারাই কামেল মুমিন ও মুসলিম হওয়া যায় ।

উপরোক্ত সকল বিষয়ের উপর আমল করার দ্বারাই কুরআন-হাদীছের অনুসরণ ও অনুকরণের সৌভাগ্য লাভ হয়। এগুলোর কোন একটিকে গ্রহণ করে অপরটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা এমনই ধ্বংসাত্মক, যেমন কেউ কান হিফাজত করলো কিন্তু চক্ষকে ধ্বংস করে দিলো।

ফিকাহকে তাছাওউফের কিংবা তাছাওউফকে ফিকাহ্র পরিপন্থী মনে করা, কানকে চোখের পরিপন্থী মনে করারই নামান্তর। যে সকল লোককে আল্লাহ্পাক কুরআন ও হাদীছের এ সকল বিষয়ের উপর এক সাথে আমল করার তাওফীক দিয়েছেন, কেবলমাত্র তারাই এ সকল বিষয়ের হাকীকত অনুধাবন করে থাকেন। এ শ্রেণীর মহান বুযুর্গদের বক্তব্য থেকেই এ ইলম ও বিষয়ের সঠিক পজিশন ও মর্যাদা জানা যাবে।

হযরত শাহ অলীউল্লাহ (রহঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

'তরীকত (তথা তাছাওউফ) বিহীন শরী 'অত একান্তই একটি দর্শন। আর শরী'অত বিহীন তরীকত ধর্মহীনতা ও খোদাদ্রোহীতা বৈ নয়।'

হযরত শাহ্ অলীউল্লাহ্ (রহঃ) এই একটি বাক্যের মাধ্যমেই ঐ ইলম ও ফুনূনের (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের) পূর্ণ হাকীকত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক আমল সম্পর্কে ইলমতো অনেক মুনাফিকেরও ছিলো, আজো শত শত ইয়াহুদী, নাসারা ও নাস্তিক এমন আছে, যারা ইসলামী ইলমের ক্ষেত্রে খুবই গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু এটা শুধুমাত্র দর্শন, দ্বীন নয়। দ্বীন বলে তখনই গণ্য হবে, যখন তার বিধানসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তার শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মা সম্বন্ধীয় আহকামের উপর আমলও করা হবে। এজন্যই কেবলমাত্র বাহ্যিক ইলম সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং গবেষণাধর্মী আলোচনাকে কোন দ্বীনী যোগ্যতা বলা হয়

না। তাছাড়া আল্লাহ্পাক ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও এর কোন মূল্য নেই।তদ্রুপ তরীকত ও তাছাওউফের নাম নিয়ে কেউ যদি শরী'আতের বিধানের খেলাফ চলে, তাহলে এটাকেও নাস্তিকতা এবং কুরআন-হাদীছের বিকৃতি বলেই আখ্যায়িত করা হবে ।(- আত্মশুদ্ধি ১৯-২০, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

বাতেনী আমলের (আত্মশুদ্ধির উপায়)সংক্ষিপ্ত তালিকা

যেরূপভাবে জাহেরী তথা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত আমলসমূহের মধ্যে কিছু জিনিস ফরজ, কিছু ওয়াজিব এবং কিছু মুস্তাহাব আছে, যা আদায় করলে অনেক সওয়াব হয় আর অমান্য করলে মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে। সাথে সাথে কিছু জিনিস হারাম, নাজায়েয এবং মাকরূহ আছে। যা করলে মারাত্মক শাস্তির ধমকি এসেছে। আর এ সকল নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগ করলে অনেক ছওয়াব পাওয়া যাবে। তদ্রুপভাবে বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের ক্ষেত্রেও ফরয, ওয়াজিব আছে। এগুলোকে (ফাযায়েল) তথা গুণ বলা হয়। আর কিছু জিনিস আছে হারাম ও নাজায়েয। যাকে (রাযায়েল) তথা দোষ বলা হয় । ঐ 'সকল ফাযায়েল (গুণাবলী) ও রাযায়েলের (দোষসমূহের) সংক্ষিপ্ত তালিকা আজকের মজলিসে পেশ করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ আগামী মজলিসে করা হবে।

বাতেনী আমলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈমান ও তার সাথে সম্পৃক্ত আকায়েদ। এগুলো এমন অত্যাবশ্যকীয় যে, এগুলো ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমানই হতে পারে না। ঈমান ও আকায়েদ সম্পর্কিত আলোচনা যেহেতু ভিন্নভাবে “ইলমে আকায়েদে’ করা হয় তাই এ বিষয়ে আলোচনা না করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের ফরয ও ওয়াজিব তাওবা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্র রহমতের আশা, আল্লাহ্র ভয়, যুহদ, (তথা দুনিয়া বিমুখতা) আমলী তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, মুহব্বত, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি, ইখলাস, আমলী সত্যবাদিতা। এগুলো পারিভাষিক শব্দ। এর ব্যাখ্যা এবং তা অর্জন করার উপায় নিচে আলোচনা করা হবে।

বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের ফরয ও ওয়াজিব

তাওবা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্র রহমতের আশা, আল্লাহ্র ভয়, যুহদ, (তথা দুনিয়া বিমুখতা) আমলী তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, মুহব্বত, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি, ইখলাস, আমলী সত্যবাদিতা। এগুলো পারিভাষিক শব্দ।

বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমলের হারাম বিষয়াবলী

কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা, যবানের দোষসমূহ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা, দুনিয়ার মুহাব্বত, কৃপণতা, লোভ, পদের মোহ, রিয়া (প্রদর্শনী-লৌকিকতা) অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। এগুলোও পারিভাষিক শব্দ।

জাহেরী এবং বাতেনী আমলের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য

জাহেরী এবং বাতেনী আমলের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, জাহেরী আমল চোখে দেখা যায়। যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল চোখে দেখা যায় । তদ্রুপ জাহেরী নিষিদ্ধ কর্মসমূহ, যেমন, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা, গীবত, চরিত্রহীনতা, বিলাস-ব্যসন ইত্যাদিও অনুভব করা যায়। প্রতিটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই এর ভাল-মন্দ দেখে চিনতে পারে। কিন্তু বাতেনী আমল, তথা অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, সম্পদের মোহ, পদের লোভ, প্রদর্শনী-লৌকিকতা, কৃপণতা, লালসা ইত্যাদি বিষয় কেউই চোখে দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি এ সকল মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জাহেরী আমলের পাবন্দ।(- আত্মশুদ্ধি ২৯-৩০, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

তাকে কেউ চিনতে পারে না যে, এ ব্যক্তি বাতেনী ফিস্‌ক ও ফুজুরীতে (অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত আছে। সে বাহ্যিকভাবে মানুষের দৃষ্টিতে সৎ, পুণ্যবান ও খোদাভীরু সেজে থাকতে পারে। অন্যের দৃষ্টি থেকে বাতেনী পাপসমূহ লুকায়িত থাকার ব্যাপারটি স্পষ্ট। এর চেয়ে বড় চিন্তার ব্যাপার হলো, কোন কোন সময় স্বয়ং আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পর্যন্ত বুঝতে পারে না। এর কারণ হলো, এ সকল রোগের আকৃতি ও প্রতিক্রিয়া এমন কাজের সাথে প্রায় মিলে যায়, যা নেক অথবা বৈধ। যেমন, অহংকার এবং আত্মসম্মান প্রায় কাছাকাছি দু'টি জিনিস। কিন্তু অহংকার হারাম। আর আত্মসম্মান রক্ষা করা শরী'অতে উদ্দেশ্য। তদ্রুপ ... (হিংসা) এবং (ঈর্ষা) প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু (হিংসা) হারাম। আর (ঈর্ষা) জায়েজ বরং শরী'আতে উদ্দেশ্য। কেননা ঈর্ষা বলা হয়, কারো সৌভাগ্য বা সম্মান দেখে এই কামনা করা যে, এই সৌভাগ্য ও সম্মান আমারও যেন লাভ হয়। এটা কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। দোষণীয় বিষয় হলো, হিংসা। কারণ হিংসা বলা হয় যে, কারো সৌভাগ্য বা সম্মান দেখে এই কামনা করা যে, এটা তার থেকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং আমাকে যেন দেওয়া হয়। এমনিভাবে আত্মার সকল রোগ ও গোনাহের সাথে কোন না কোন গুণ ও ছওয়াবের কাজ প্রায় মিলে যায়। এ কারণেই স্বয়ং আধ্যাত্মিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পর্যন্তও

ধোঁকায় পড়ে যায়। অহংকারকে আত্মসম্মান আর হিংসাকে গিবতা (ঈর্ষা) মনে করে নিশ্চিত থাকে ।

আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তা

এজন্য আত্মার রোগের চিকিৎসা সাধারণতঃ এমন কোন কামেল পীর ও মুর্শিদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে করতে হয়, যিনি আত্মার রোগ ও গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং তিনি নিজেও আত্মার রোগ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন এবং অন্যদেরকে বেঁচে থাকার জন্য হিদায়েত করেন। অতঃপর শাইখ (পীর) যখন রোগ নির্ণয় করে তা থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাপত্র দিবেন। তখন সেই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করে ঐভাবে আমল করতে হবে, যেরূপ শারীরিক রোগের কোন রোগী তার চিকিৎসার ব্যাপারে নিজকে নিজে কোন ডাক্তার বা হাকীমের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে তার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্রকে মেনে নিয়ে আমল করতে থাকে। এমনকি রোগী নিজেও যদি ডাক্তার কিংবা হাকীম হয়, তাহলেও রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজ সিদ্ধান্ত ও রায় ত্যাগ করে চিকিৎসকের আদেশ পূর্ণরূপে মেনে চলে। জাহেরী আমলে শুদ্ধতা ও অনিষ্টতা তো কোন উস্তাযের নিকট পড়া-শোনা করে কিংবা কিতাব পড়ে কিছু না কিছু জানা যায়। কিন্তু বাতেনী আমলের সংশোধনের জন্য শুধুমাত্র কিতাব পড়ে নেওয়া (চাই তা পড়ে পূর্ণভাবে বুঝতে পারলেও যথেষ্ট নয়। কারণ বাতেনী আমল তথা আত্মার পরিশুদ্ধি কোন কামেল পীরের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। অলৌকিক ঘটনারূপে যদি আল্লাহপাক কাউকে কোন দৌলত বাহ্যিক উপকরণ ব্যতীত দিয়ে দেন, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক নিয়ম বলা যাবে না ।

বাতেনী আমল সংশোধনের জন্য ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর প্রস্তাব

আল্লাহপাক ইমাম গাযালী (রহঃ)কে বাতেনী বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যাপারে আল্লাহপাক তাকে বিশেষ পদ্ধতি দান

করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ও মত হলো, স্বীয় বাতেনী গোনাহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পদ্ধতি চারটি। (- আত্মশুদ্ধি ৩১-৩২, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

প্রথম পদ্ধতি ঃ কামেল পীরের অনুসরণ

আত্মার রোগ সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সংশোধন করার সবচেয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হলো, এমন কোন কামেল পীর খুঁজে নেওয়া, যিনি শরী 'অত ও তরীকতের সমন্বয়কারী, অন্তরের গুপ্তগুণাবলী ও দোষসমূহ নির্ণয় করা ও তার চিকিৎসার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

আউলিয়ায়ে কেরামের পরিচয়

কামেল অলীআল্লাহ্ হওয়ার জন্য কয়েকটি জিনিস শর্ত ।

প্রথম শর্তঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্ভব না হলেও প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা, যেন দ্বীনী আহকামের উপর আমল করতে পারে।

দ্বিতীয় শর্তঃ সব সময় শরী'আতের আহকাম তথাঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায়ে কোনরূপ অবহেলা না করা। হারাম ও মাকরূহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। যদি কোন সময় কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তাওবা করা ।

তৃতীয় শর্তঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহপাকের যিকির করা। অর্থাৎ, (দিনের ও রাতের) অধিকাংশ সময় যিকিরে লিপ্ত থাকা। চাই সে যিকির দু'আ-দুরূদ ও তাছবীহ পাঠের মাধ্যমে হোক বা একমাত্র আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে দ্বীনী শিক্ষাদান, কিতাব রচনা ও সংকলন, ফতোয়া প্রদান বা মানুষকে ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে হোক। কেননা এ সকল জিনিসও ইখলাসের সাথে করলে যিকিরের মধ্যে গণ্য হয়।

চতুর্থ শর্তঃ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কামেল পীর কর্তৃক অন্যান্য মানুষের আত্মশুদ্ধি ও পথ প্রদর্শনের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে।

পঞ্চম শর্তঃ তার সংসর্গে (সোহবতে) কিছুদিন বসলে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ এবং দুনিয়ার অহেতুক ঝামেলার প্রতি ভীতিভাবের উন্মেষ ঘটে থাকে।

উপরোক্ত এই ক'টি বৈশিষ্ট্য ও শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে-ই আত্মার সংশোধনকারী ও পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে যথেষ্ট হবে । উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি যদি

একাধিক হয়, তাহলে তাদের মধ্য হতে যার প্রতি ভক্তি ও মুহাব্বত বেশী হবে এবং যার সাথে মন-মানসিকতা ও মেজাযের মিল বেশী হবে, তাকেই স্বীয় মুর্শিদ (পীর) নির্বাচন করবে।(- আত্মশুদ্ধি ৩৩, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় পদ্ধতি

যদি কেউ উপরোক্ত শর্ত ও গুণাবলী বিশিষ্ট কোন কামেল পীর (মুর্শিদ) খুঁজে না পায়, তাহলে তার জন্য ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, সে যেন নিজের মুখলিস বন্ধুদেরকে আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের জন্য নিজের উপর নিয়োজিত করে নেয়। সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের দৃষ্টিতে আমার মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে? তারা যা যা বলবেন, সেগুলো সংশোধনের চিন্তা করবে।

হযরত ফারুকে আযম উমর (রাযিঃ) হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে নিজ ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)-কে বললেনঃ আপনি আমার (দ্বীনী) ভাই! আপনি আমার মধ্যে কি কি দোষ লক্ষ্য করে থাকেন, আমাকে বলুন! প্রথমেতো হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) আদবের কারণে বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু হযরত উমরের (রাযিঃ) পীড়াপীড়িতে বলতে বাধ্য হলেন যে, আমি আপনার মধ্যে দু'টি দোষ দেখি ।

প্রথম দোষ এই যে, আপনার দস্তরখানে একাধিক প্রকারের খানা দেখা যায়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসের পরিপন্থী। দ্বিতীয় দোষ এই যে, আপনার নিকট একাধিক জোড়া কাপড় দেখা যায়, যার এক জোড়া আপনি দিনে ব্যবহার করেন এবং অপর জোড়া রাতে ব্যবহার করেন ।

হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ) একথা শুনে বললেন, এ দুই রোগের চিকিৎসা ইনশাআল্লাহ এখনই করা হবে। আপনি এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। (ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ৭:৩৪৪)

হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী সকল বুযুর্গের সর্বদা এই অভ্যাস ছিলো যে, তারা তাদের নফসের (প্রবৃত্তির) দোষ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতেন এবং তার চিকিৎসার ব্যাপারেও কখনো অলসতা করতেন না ।

আত্মশুদ্ধির তৃতীয় পদ্ধতি

আত্মশুদ্ধির তৃতীয় পদ্ধতি হলো, নিজ শত্রু দ্বারা নিজের সংশোধন করানো। এটা এইভাবে করাবে যে, শত্রুপক্ষ দোষ তালাশ করতে গিয়ে যে সকল দোষের কথা বলে, সেগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবে । অতঃপর নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, শত্রুপক্ষের কোন্ কোন্ কথা সত্য এবং তাদের বলা কোন্ কোন্ দোষ আমার ভেতর আছে? যেগুলো বিদ্যমান আছে, সেগুলো দূর করার চিন্তা ও চেষ্টা করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সাধারণ নিয়ম এটাই ছিলো। (- আত্মশুদ্ধি ৪০)

পরিশেষে একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার যে, 'মহব্বতের মাকাম' হাসিলের আসল পদ্ধতি হলো, কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাহচর্যে দীর্ঘ দিন থাকা। কোন কামেল পীরের হাতে নিজকে সঁপে দেওয়া ব্যতীত সাধারণতঃ এই মাকাম লাভ হয় না। কারণ হলো, লোকের স্বভাবের বিভিন্নতার কারণে এ সকল মাকাম হাসিলের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। আর কার জন্য কোন পদ্ধতি উপকারী, সেটা কামেল পীরই অনুধাবন করতে পারেন।(- আত্মশুদ্ধি ৫৩-৫৪, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

মাকামে শওক ও উন্ছ

যে সকল বাতেনী আমল বা আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জন করা মানুষের জন্য আবশ্যক, তার মধ্য হতে একটি হলো, (শওক ও উন্‌হ) ইহা তাছাওউফের দু'টি পরিভাষা। এ (শওক) এর অর্থ হলো, যে সকল উত্তম গুণ এখনো অর্জন হয়নি, সেগুলো অর্জনের জন্য অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। আর (উন্ছ) শব্দের অর্থ হলো, যে সকল উত্তম গুণ অর্জিত হয়েছে, তাতে অন্তর প্রফুল্ল থাকা। যদি মানুষ তার আধ্যাত্মিক জগতকে ঠিক রাখতে চায়, তাহলে

সেটা অন্তরে এ দু'টি বিষয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু অন্তরের অবস্থা অত্যন্ত স্পশকাতর। ভাবাবেগের এ গোপন জগতে অনেক সময় দু'টি বিপরীত জিনিস একই সাথে চলতে থাকে। এ অবস্থায় অন্তরকে সঠিক অবস্থানে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। ভাল জিনিস অর্জন করার আগ্রহ প্রশংসনীয় গুণ। কিন্তু যদি এই আগ্রহই সীমার বাইরে চলে যায়, তাহলে সেটা অকৃতজ্ঞতা এবং বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ব্যাপারটা যদি এ পর্যন্ত সীমিত হয় যে, ভাল জিনিসের প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে লাইন ঠিক আছে। কিন্তু যদি এটাকে আরেকটু অগ্রসর করে স্বীয় তাকদীরের (ভাগ্যের) প্রতি অভিযোগ শুরু করা হয়, তাহলে এটাই না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতা হবে। অথবা যদি এ নেয়ামত অন্যের কাছে দেখে অন্তরে অন্তরে জ্বলতে শুরু করে, তাহলে এটাই বিদ্বেষ হয়ে যাবে। তদ্রুপভাবে কেউ যদি স্বীয় নেক কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং এতে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে তাহলে এটাকে (উন্ছ) বলা হবে। যা প্রশংসনীয় এবং ঈমানের আলামত। যেমন, হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

اذا سرتك حسنتك وسائتك سيئتك فانت مؤمن او كما قال

অর্থাৎ, যখন তোমার নিজের নেক কাজে আনন্দ হবে এবং নিজের অসৎ কাজে দুঃখ হবে, তখন তুমি নিজকে মুমিন মনে করো (মুসনাদে আহমাদ ৬:৩৪১, তিরমিযী ২:৩৯)

কিন্তু এক্ষেত্রে যদি সীমালংঘন হয়ে আত্মমুগ্ধতা ও আত্মতৃপ্তির পর্যায়ে (আত্মাশ্লাঘা) হয়ে যাবে, যা সম্ভবত এসে যায়, তাহলে এটা অন্তঃজগত ধ্বংস হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকরণ। মোটকথা। নিজের কোন ভাল গুণ তখনই প্রশংসনীয় হবে যখন এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে যে, আল্লাহপাক স্বীয় দয়া ও রহমতে আমাকে এটা দান করেছেন। আল্লাহর রহমত ব্যতীত আমি যদি এ গুণ অর্জনের চেষ্টা করতাম, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত অর্জন করতে পারতাম না। পক্ষান্তরে যদি কেউ একথা মনে করে সন্তুষ্ট হয় যে, এই প্রশংসনীয় গুণ আমার নিজের কামাই এবং এতে আমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া বুঝে আসে, তাহলে এই আত্মতৃপ্তিই ৬ (আত্মশ্লাঘা) হয়ে যাবে এবং সকল আমলকে নষ্ট করে দিবে। (-আত্মশুদ্ধি ৫৫, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

মাকামে রেযা বিলক্কাযা

আত্মার জন্য যে সকল সৎ গুণ অর্জন করা আবশ্যক, তার মধ্য হতে একটি হলো, 'রেযা বিলক্কাযা' (অর্থাৎ, আল্লাহপাকের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা)। এটাই সেই জিনিস, যা বিপদের সময় মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে। এর দ্বারাই মানুষের দুঃখ-বেদনা সুখ ও স্বস্তিতে রূপান্তরিত হয়। রেযা বিলক্কাযার অর্থ হলো, আল্লাহপাকের পক্ষ হতে মানুষের জন্য যে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, তার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের তাকদীরের প্রতি কোন অভিযোগ না করা । আল্লাহপাকের ফায়সালার প্রতিও কোন অভিযোগ না করা। বরং সুখে-দুঃখে, শান্তি ও বেদনা সর্বাবস্থায় একথা মনে রাখা যে, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যা হয়েছে, এটাই সমীচীন ছিলো। মোটকথা, 'রেখা বিলক্কাযা' দ্বারা আসল উদ্দেশ্য হলো, দুঃখ-বেদনার অবস্থায়ও যেন মুখ অথবা অন্তর থেকে কোন অভিযোগ ও আপত্তিকর বাক্য নির্গত না হয়। বরং দুঃখ-বেদনার সময়ও সর্বদা যবান আল্লাহপাকের শোকর ও প্রসংশায় লিপ্ত থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে উৎসাহিত করেছেন যে, যখন কেউ বিপদগ্রস্ত হবে, তখনও পড়বে

الحمد لله على كل حال

অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সকল প্রসংশা আল্লাহ্র জন্য। (ইবনে মাজাহ ২৬৯)

আল্লাহপাক যে অবস্থায় রাখেন সেটাই ভাল উপরোক্ত শিক্ষার যৌক্তিকতা এই যে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি একেবারে সীমিত। প্রকৃত পক্ষে মানুষ তার মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝতে পারে না। অনেক সময় মানুষ কোন জিনিসকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে করে, অথচ বাস্তবে তা তার জন্য ক্ষতিকারক হয়। অথবা কোন জিনিসকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, অথচ বাস্তবে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। মানুষ যদি তার চারপাশে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে এ কথার হাজারো সাক্ষ্য সে তার দৈনন্দিন জীবনে পেয়ে যাবে। (- আত্মশুদ্ধি ৫৬)

যে সকল জিনিস অন্তরকে ধ্বংস করে

এ পর্যন্ত বাতেনী আমলের ফরয সমূহের (যা অর্জন করা মানুষের জন্য আবশ্যক) আলোচনা করা হলো। সূফীয়ায়ে কেরাম এগুলোকে ''ফাযায়েল' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) এ সকল ফাযায়েলের নামকরণ করেছেন (মুক্তির উপকরণ) বলে। এ সকল

বিষয়ের বিপরীতে বাতেনী আমলসমূহের মধ্যে কিছু আমল আছে হারাম এবং না জায়েয। সূফীয়ায়ে কেরাম এগুলোকে (দোষসমূহ) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) এগুলোকে (ধ্বংসের উপকরণ) বলে নামকরণ করেছেন ।(- আত্মশুদ্ধি ৫৯)

সকল দোষের মূল

এ যাবত আমরা (গুণাবলী) এর আলোচনা করেছি। এখন সংক্ষেপে (দোষসমূহ) এর আলোচনা করবো। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটি কথা মনে গেঁথে নেওয়া দরকার। আর তাহলো, অন্তরের সকল রোগের মূল এবং সকল দোষের মূল হলো, প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনা চরিতার্থের প্রচেষ্টা। কুরআনে কারীমের পরিভাষায় এটাকে (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনার অনুসরণ) বলে আখ্যায়িত করেছে। অন্তরের যে রোগ নিয়েই আপনি চিন্তা করবেন, দেখবেন তার মূল কারণ এটাই যে, মানুষ তার প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি ও কামনা-বাসনার সামনে আত্মসমর্পণ করে অসহায় সেজে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে তার দ্বারা কোন পাপ কাজও হয় না এবং তার অন্তরে কোন আধ্যাত্মিক রোগও জন্ম নেয় না। এজন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বার বার তাকীদ করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

ولا تتبع الهوى فيضلك عَنْ سَبِيلِ اللهِ

অর্থাৎ, খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, (কারণ) তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। (সূরা ছোয়াদ ২৬ আয়াত)

কাজেই কোন ব্যক্তি যদি চায় তার অন্তর আভ্যন্তরীণ (বাতেনী) রোগ মুক্ত হোক এবং তার সকল আধ্যাত্মিক দোষ বিনাশ হয়ে যাক, তাহলে তাকে সর্ব প্রথম নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কুরআনে কারীমের আয়াত নিয়ে গবেষণা করার ফলে নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার তিনটি পদ্ধতি বুঝে আসে। একটি পদ্ধতি সাধারণ এবং সংক্ষেপ। অপর দু'টি বিশেষ এবং বিস্তারিত।

সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো, অন্তরে আখিরাতের চিন্তা এবং আল্লাহপাকের নিকট জবাবদিহিতার কথা সব সময় জাগ্রত রাখা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি মতো চলা) থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাযি'আত ৪০-৪১)

এ আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হলো, অন্তরে আল্লাহপাকের সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় সৃষ্টি করা। এ কথাতো প্রতিটি মুসলমানই জানে যে, মৃত্যুর পর আমাকে একদিন আল্লাহপাকের সামনে দাড়াতে হবে। কিন্তু এ কথাটি যত বড় সত্য, দৃষ্টি হতে এটা বিচ্যুতও হয় ততবেশী। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জরুরী হলো, এ বাস্তব বিষয়টিকে অন্তরের মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে নেওয়া যে, কোন সময়ই যেন আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার কথাটি অন্তর থেকে মুছে না যায়। আর এটা মউতের ধ্যান (মুরাকাবাহ্) দ্বারা হাসিল করা যায়। প্রতিটি লোকেরই উচিত যে, প্রতিদিন কমপক্ষে একবার পাঁচ/দশ মিনিট নিজের মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করা। সাথে সাথে প্রতিদিনের আলাপ চারিতায় মৃত্যুর আলোচনাকে আবশ্যক করে নেওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اكثروا ذكر هاذم اللذات

অর্থাৎ, সকল স্বাদ বিনাশকারী অর্থাৎ, মৃত্যুর আলোচনা অধিক পরিমাণে করো। (তিরমিযী ২৪৫৭, নাসায়ী ১ঃ 202)

মৃত্যুর আলোচনা অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের চিন্তা জাগ্রত করবে। আর এর আবশ্যম্ভাবী ফল এই হবে যে, স্বীয় নফসের খাতেশাত (প্রবত্তির খেয়াল-খশি ও কামনা-বাসনা) এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। এটা নফসের অনুসরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সাধারণ চিকিৎসা। এছাড়া প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা (নফসের খাহেশাত) থেকে যে সকল গোমরাহী সৃষ্টি হয়, তা দুই প্রকার। (১) চিন্তা-চেতনা (দৃষ্টি ভঙ্গিগত) ও মতবাদগত পথভ্রষ্টতা। (২) , আমল ও কর্মগত পথভ্রষ্টতা। (- আত্মশুদ্ধি ৬০-৬৩, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

পবিত্র কুরআনে প্রথম প্রকারের পথভ্রষ্টতার চিকিৎসা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছেঃ, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দাও। (সূরা আসর ২)

দ্বিতীয় প্রকারের চিকিৎসা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وتواصوا بالصبر

অর্থাৎ, একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও। (সূরা আসর ৩ আঃ) ধৈর্যের অর্থ হলো, নফসের কামনা-বাসনা চরিতার্থ না করার দরুণ যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করা। আর সত্যি বলতে কি নেক লোকদের সংসর্গে (দীর্ঘদিন) অবস্থান করা ব্যতীত এ গুণ সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে পয়দা হয় না। এ কারণেই 'বুযুর্গানে দ্বীন' সাধারণতঃ আত্মশুদ্ধির জন্য কোন কামেল শাইখের নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়া জরুরী মনে করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সংসর্গে থাকো। (সূরা আত-তাওবাহ ১১৯)

মুজাহাদা বা সাধনা

জানা আছে যে মানুষের অন্তরে যে সকল কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়, তা দুই প্রকার। (১) হুকুকে নফস এবং (২) হুযূযে নফস ।

হুকুকে নফস ঐ সকল জিনিসকে বলে, যে সকল জিনিসের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। যেমন, পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, চলা-ফেরা এবং প্রয়োজন অনুসারে বৈধভাবে যৌন চাহিদা মিটানো। এসবই হুকুকে নফসের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল চাহিদা পূরণ করা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ফরয এবং ওয়াজিবও হয়ে থাকে। এ সকল হুকুক পূর্ণ না করা বৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী।

হুযুযে নফসঃ নফসের এমন সম্ভোগকে (চাহিদাকে) বলা হয়, যা মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত। তাছাওউফের পরিভাষায় (রিপু দমন) এবং (প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধাচারণ) বলতে এ সকল কামনা-বাসনা ও সম্ভোগ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, মানুষ যেন অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়। এ বিষয়ের প্রতিই পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছেঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা আন-নাযিআত ৪০-৪১)

কামনা-বাসনা, যা হুযে নফসের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।(- আত্মশুদ্ধি ৬৮-৬৯, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

মুজাহাদা বা সাধনার অর্থ হলো, নাজায়েয এবং গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু কিছু জায়েয কাজ ত্যাগ করার অভ্যাস করা। এ ধরনের মুজাহাদা বা সাধনা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বরং যখন নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এ সকল মুজাহাদাও পরিত্যাগ করা হয়।

পূর্ব যুগে সূফিয়ায়ে কেরাম এ উদ্দেশ্যে কঠিন কঠিন মুজাহাদা-সাধনা করতেন। বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট চারটি মুজাহাদার প্রচলন রয়েছে।

(১) খাদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করা। (২) নিদ্রাভ্যাস ত্যাগ করা ।

(৩) কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা ।

(৪) মানুষের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করা ।

এ যুগের মুজাহাদা বা সাধনা

কিন্তু যেহেতু আমাদের এ যুগের মানুষের শারীরিক গঠন এ ধরনের কঠোর মুজাহাদা বা সাধনা সহ্য করতে পারবে না, এজন্য আমাদের শাইখ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এ সকল মুজাহাদার (সাধনার) মধ্য হতে (পরিত্যাগ) শব্দকে (স্বল্প করণ) শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত বলতেন, এ 'যুগে যদি পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। এজন্য এ যুগের মুজাহাদা হলো, উপরোক্ত বিষয়গুলোতে প্রয়োজনানুসারে স্বল্পতা সাধন করা।(- আত্মশুদ্ধি ৭০)

আত্মার পরিশুদ্ধির পদক্ষেপসূহ নিচে আলোচনা করা হলঃ

আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ : তাওবা

صد بار اگر توبه شکستی باز آ

অর্থাৎ, শতবার যদি তাওবা ভঙ্গ করে থাকো, তবুও ফিরে এসো। কোন লোক যদি চায় যে, তার আভ্যন্তরীণ জগত সুস্থ হোক এবং তার সকল আধ্যাত্মিক রোগ দূর হয়ে যাক, সে

আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করে দোযখের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করুক, তাহলে এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো তাওবা।

সাধারণভাবে লোকেরা তাওবা বলতে একথা বুঝে যে, কেবলমাত্র মুখে পড়া। অথচ এটা একটা মারাত্মক ধরনের ভুল ধারণা। কারণ তাওবার প্রকৃত অর্থ হলো, বিগত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। যতটুকু সম্ভব তার ক্ষতিপূরণ করা এবং ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার দৃঢ় পণ করা।

ইমাম গাযালী (রহঃ) এ কথাটি খুবই সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেনঃ এ দুনিয়ায় ভাল-মন্দ মিলে-মিশে থাকে। ঐ সকল জিনিসের মধ্যে তাকওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার উপকরণ যেমন আছে, তেমনি পাপ-পঙ্কিলতার প্রতি আকর্ষণ করার উপকরণও আছে। অনেক জিনিস এমন আছে, যা আপনাকে নেক ও ছওয়াবের কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অনেক জিনিস এমন আছে যা আপনাকে গোনাহের কাজের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব হলো, গোনাহের চাহিদাকে পরাজিত করে নেক কাজের আগ্রহকে বিজয়ী করা। তিনি আরো বলেন, এর দৃষ্টান্ত হলো ঐ স্বর্ণ যার মধ্যে 'খাদ' মিলানো আছে। (- আত্মশুদ্ধি ৭২-৭৩, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

এ স্বর্ণকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করতে হলে এ স্বর্ণ থেকে খাদকে পৃথক করতে হবে। আর এজন্য একমাত্র উপায় হলো, আগুনে তাপ দিয়ে এই স্বর্ণকে গলানো। আগুনের তাপে স্বর্ণকে গলানো হলেই খাদ মুক্ত করা যাবে। অন্যথায় নয়। ঠিক এরূপভাবেই মানুষের নেকীকে বদী থেকে পৃথক করার জন্য তাপের প্রয়োজন হয়। এই তাপ যা মানুষকে ভেজালমুক্ত করে, তা দুই প্রকার। একটি হলো দোযখের আগুনের তাপ । কারণ মুমিন ব্যক্তিকে যদি জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হয়, তাহলে তা কেবল তাকে পাপ-পঙ্কিলতার ভেজাল মুক্ত করার জন্যই হবে। শুধু শাস্তির জন্য নয়। বরং এভাবে পাক-সাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করানোই উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং জ্বালানোর উদ্দেশ্যেই স্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُور

অর্থাৎ, আমি কাফের ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা সাবা ১৭)

অপরটি হলো, আফসোস ও অনুশোচনার তাপ । এটা এমন তাপ যা এ দুনিয়াতেই ভেজালকে গলিয়ে খাঁটি জিনিষ হতে পৃথক করে থাকে ।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেনঃ মানুষকে ভেজালমুক্ত হওয়ার জন্য এই দুই প্রকার তাপ হতে কোন না কোন প্রকার তাপে অবশ্যই দগ্ধ হতে হবে। এখন (তার ইচ্ছা) সে যদি চায় তাহলে নিজের জন্য জাহান্নামের আগুনকে অবলম্বন করতে পারে। আর যদি এটা তার কাছে কষ্টকর মনেহয়, (যা আসলেও অনেক কষ্টকর) তাহলে তার জন্য এ দুনিয়াতেই নিজ অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই আফসোস, অনুতাপ ও অনুশোচনার নামই 'তাওবা'। এজন্য হাদীছ শরীফে বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ অনুশোচনাকেই তাওবা বলে।
(মুসনাদে আহমাদ ১৪৬২১, ইবনে মাজাহ ৩১৩)

তাওবার উপকরণ

তাওবার তিনটি উপকরণ

এখন প্রশ্ন হলো, এই অনুশোচনা কিভাবে পয়দা হবে। এর উত্তর এই হবে যে, অনুশোচনা পয়দা করার একমাত্র উপায় হলো, ইলম।

তাওবার প্রথম উপকরণ : ইলম

কারণ যে পর্যন্ত মানুষ একথা জানতে না পারবে যে, আমি যা করেছি তা ভুল করেছি, ক্ষতির কাজ করেছি, সে সময় পর্যন্ত তার কৃতকর্মের প্রতি অনুতাপ ও অনুশোচনা হবে না। যে ব্যক্তি একথাই জানে না যে, আমি যা পান করেছি তা বিষ, সে কিভাবে বিচলিত হবে? সে বিচলিত তখনই হবে, যখন জানতে পারবে যে, আমি বিষ পান করেছি। এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক জিনিস।

তদ্রুপভাবে মানুষ যতক্ষণ না একথা জানতে পারবে যে, আমি যে কাজ করেছি তা পাপ, অবৈধ এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত, সে সময় পর্যন্ত তার ঐ কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হবে না। সুতরাং অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন পয়দা করার প্রথম পথ হলো, গোনাহকে যাতে গোনাহ হিসেবে চেনা যায়, তার জন্য পর্যাপ্ত ইলম হাসিল করা। (-আত্মশুদ্ধি ৭৪-৭৫, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

এজন্য শুধু শাব্দিক বা প্রচলিত ইলম যথেষ্ট নয়। বরং এমন ইলম হাসিল করতে হবে, যা অন্তরে আখিরাতের ফিকির, আল্লাহর ভয় এবং গোনাহের প্রতি আগ্রহের চেয়ে ঘৃণা বেশী সৃষ্টি করে । এজন্যই কুরআনে কারীমে আল্লাহ্র ভয়কে ইলমের চিহ্ন বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে উলামায়ে কেরামই তাঁকে ভয় করেন। (সূরা ফাতির ২৮)

যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ফিকির এবং গোনাহের ক্ষতির ইলম ও ইয়াকীন নেই, সে আলেম নয় বরং চরম পর্যায়ের মূর্খ। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

جان جمله علماها این است و این

که بدانی من کیم در یوم دین

অর্থাৎ, সকল ইলমের সারাংশ এই কথা অনুধাবন করা যে, হাশরের দিন আমার অবস্থা কেমন হবে?

তাওবার দ্বিতীয় উপকরণঃ অনুশোচনা

উপরোক্ত ইলম হাসিল করার পর তাওবার জন্য দ্বিতীয় উপকরণ হলো, অনুশোচনা। কারণ যখন কোন ব্যক্তি কোন গোনাহের কাজ সম্পর্কে একীনীভাবে জানতে পারবে যে, এটা একটা ধ্বংসাত্মক কাজ, তখন যদি সে অতীতে এ কাজ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে।

তাওবার তৃতীয় উপকরণঃ ক্ষতিপূরণ

এরপর তাওবার তৃতীয় উপকরণ হলো, 'ক্ষতিপূরণ' । এজন্য দু'টি কাজ করা আবশ্যক। (১) ভবিষ্যতে কোন গোনাহ্র কাজ না করার জন্য মজবুত শপথ গ্রহণ। (২) অতীতে যে গোনাহ হয়েছে, যদি তা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে যথাসম্ভব সে হক আদায় করে দেওয়া। যেমন, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছিলো, এটা ফিরিয়ে দেওয়া । অথবা কাউকে হাত বা যবান দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকলে, তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদি ।

আর যদি অতীতের গোনাহের সম্পর্ক আল্লাহপাকের হকের সাথে হয়, তাহলে যে সকল গোনাহের ক্ষতিপূরণ কাজা অথবা কাফফারা দ্বারা করা সম্ভব। সেগুলো সেভাবেই ক্ষতিপূরণ করা। যেমন, নামায অথবা রোযা ছুটে গিয়ে থাকলে তার কাজা করা। আর যদি কসম

করে তা ভঙ্গ করা হয়ে থাকে, তাহলে তার কাফফারা আদায় করা।আর যদি গোনাহ এমন হয় যে, কাজা বা কাফফারার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়, তাহলে আল্লাহ্পাকের নিকট অত্যন্ত বিনয় ও অসহায়তা প্রকাশ করে ইস্তিগফার করতে হবে। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর দরবারে এ সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হতো। তিনি তাওবার সময় অতীতের গোনাহের ক্ষতিপূরণের সকল সম্ভাব্য দিক কাজে লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন এবং উৎসাহিত করতেন ।(-আত্মশুদ্ধি ৭৬, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

যদি উপরোক্ত নিয়মে তাওবা করা হয় তাহলে, হযরত থানভী (রহঃ) এর ভাষায় ‘একটি লোক সামান্য সময়ের মধ্যেই আল্লাহপাকের কামেল ওলী হতে পারে। কারণ হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেনঃ

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির মতো, যে কোন গোনাহ করেনি। (ইবনে মাজাহ শরীফ ৩১৩)

তাওবার এই দরজা প্রতিটি মানুষের জন্য ঐ সময় পর্যন্ত খোলা থাকে, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর লক্ষণ শুরু হয়ে যায়। মৃত্যুর লক্ষণ আরম্ভ হওয়ার পর তার তাওবা কবুল হয় না।

আত্মশুদ্ধির পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ ধৈর্য

মাকামে সবর বা ধৈর্য ও তার প্রকারভেদ

আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাওবার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জাহের ও বাতেন (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ) যিন্দেগীকে সংশোধন করার জন্য ফিকির করবে। এর অর্থ এই যে, আল্লাহপাক যে সকল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে এবং যে সকল জিনিস নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকবে।

সবর এর শাব্দিক অর্থ হলো, বাধা দেওয়া। আর ইসলামী পরিভাষায় সবর বলা হয়, নিজে নিজেকে নাজায়েয খেয়াল-খুশি থেকে বিরত রাখা ।

এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কুরআনে কারীম এবং ইসলামী পরিভাষায় সবর শব্দটির অর্থ কেবল এ নয় যে, কোন দুঃখ-কষ্টের সময় হা-হুতাশ না করা [যেমন- সাধারণ আলোচনায় সবর শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়] বরং তার ইসলামী পারিভাষিক

অর্থের গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং ব্যাপক। এ অর্থে দ্বীনের প্রায় সকল শাখা সবরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে : মাকামে সবর হাসিল করার জন্য যেরূপ তাকিদ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ অন্য কোন বিষয়ে এরূপ তাকীদ করা হয় নাই। সাথে সাথে এর বিনিময় এবং ছওয়াবও এত বেশী বলা হয়েছে, যা অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। সুতরাং কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبِرِ

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে সত্য এবং ধৈর্যের উপদেশ দাও ।(সূরা আসর ২-৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে ।(সুরা যুমার ১০)

(- আত্মশুদ্ধি ৭৯, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

দু'টি শক্তি এমন আছে, যা মানুষকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। তার মধ্যে একটি মানুষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে, যাকে নাফসে আম্মারাহ বলা হয়। এটাই নফসানী খাহেশাত তথা প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি বা কামনা-বাসনার এমন উৎসস্থল, যা নেক কাজে ফাঁকি দেওয়ার এবং গোনাহের কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার জযবা পয়দা করে থাকে। আর পাপের প্রতি উৎসাহিত করার দ্বিতীয় শক্তি হলো শয়তান। সে তার জীবনের উদ্দেশ্যই বানিয়েছে মানুষকে নেক কাজ থেকে দূরে রেখে গোনাহের কাজে লিপ্ত করে দেওয়াকে । এই দুই ধরনের শক্তির টানাটানির মধ্যেই মানুষের জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য জরুরী হলো, মানুষ গোনাহের চাহিদার উপর নেক কাজের আগ্রহকে প্রাধান্য দিবে, বিজয়ী করবে। এটাকেই শরী অতের পরিভাষায় বা ধৈর্য বলে।

প্রথম দিকে মানুষের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়। কিন্তু একবার যদি কষ্ট করে এই তিক্ত ঔষধ খেয়ে নেয়, তাহলে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এ কাজ আল্লাহপাক তার জন্য সহজ করে দেন।

এভাবে তার নফস নাফসে মুতমাইন্নাহ (প্রশান্ত হৃদয়) হয়ে যায়। অর্থাৎ তার নফসের উত্তম কাজের চাহিদা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, পাপ ও খারাপ কাজের চাহিদা তার নিকট একেবারে দুর্বল এবং মৃতপ্রায় হয়ে যায়। এ কথাটিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেনঃ

من يتصبر يصبره الله

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধৈর্যের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, আল্লাহপাক তাকে সবর এর মাকাম দান করেন।

(বুখারী শরীফ ১:১৯৮, মুসলিম শরীফ ১৪৩৩৭)
আর যে ব্যক্তি এই মহান নিয়ামত লাভ করে, তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

ما اعطى احد عطاء خيرا و اوسع من الصبر

অর্থাৎ, ধৈর্যের চেয়ে উত্তম এবং প্রশস্ত কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি। (সহীহ বুখারী ১:১৯৮, তিরমিযী ২:২২) (- আত্মশুদ্ধি ৮১-৮২, মুফতি মুহাম্মদ শফী)
ধৈর্যের এই (উচ্চ) মাকাম হাসিল করার আসল তরাকা হলো, সবর বা ধৈর্যের এই মাকাম যে সকল বুযুর্গদের নসীব হয়েছে, তাদের সোহবত বা সংসর্গ অবলম্বন করা। অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, পরিবেশ এবং নেক সোহবতের চেয়ে বড় শিক্ষক মানুষের জন্য আর কিছুই নেই। মানুষ যদি ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এবং পরিবেশে থাকে, তাহলে সেও ধীরে ধীরে ধৈর্যশীল হয়ে যাবে।
এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সবরের (বা ধৈর্যের) মাকাম হাসিল করার পদ্ধতি হলো, যখন অন্তরে কোন পাপের খেয়াল আসবে, তখনই পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে এই গোনাহর প্রতি যে সতর্কবাণী ও মারাত্মক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা কল্পনা করবে এবং সাথে সাথে স্বীয় মৃত্যু, পরিণতি ও কবরের একাকিত্ব ও নির্জনতার কথা স্মরণ করবে। এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর চিন্তার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেনঃ

اكثروا ذكرها اذم اللذات الموت

অর্থ, সকল স্বাদ বিনাশকারী অর্থাৎ মউতকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর । (তিরমিযী ২৪৭৫, নাসায়ী ১:২০২) (- আত্মশুদ্ধি ৮২)

আত্মশুদ্ধির পথে ৩য় পদক্ষেপঃ

মাকামে শোকর

شکر نعمت ھائے تو چندان که نعمت ھائے توا

অর্থঃ আপনার নেয়ামত যত প্রচুর পরিমাণ, শোকরও করি ততধিক পরিমাণ ।

صبر

- (তথা ধৈর্য) এর পর দ্বিতীয় যে মাকামটি অর্জন করা ফরয, তাকে 'মাকামে শোকর' বলা হয়। আপনি যদি কুরআনে কারীম পড়ে থাকেন, তাহলে এ ধরনের অসংখ্য আয়াত দেখে থাকবেন, যে সকল আয়াতে শোকর আদায় করাকে মানুষের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে

। আজকের মজলিসে সংক্ষিপ্তাকারে এ কথা বর্ণনা করা হবে যে, এ শোকরের অর্থ কি এবং শোকরের এই মাকাম কিভাবে অর্জন করা যাবে?

শোকরের হাকীকত এই যে, প্রকৃত দাতা- আল্লাহপাকের নেয়ামত সমূহের এভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা, যেন এর দ্বারা স্বীকৃতি প্রদানকারী বান্দার অন্তরে আল্লাহপাকের মুহাব্বত এবং তাঁর আনুগত্যের জযবা পয়দা হয়। মোটকথা শোকরের জন্য তিনটি আবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে।

(১) এ কথা মেনে নেওয়া এবং স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আমি যত নেয়ামতের অধিকারী হয়েছি, তার সবই আল্লাহপাকের পক্ষ হতে এবং এগুলো সবই তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেছেন ।

(২) যেহেতু আল্লাহপাক আমার প্রতি তার দয়া ও করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করে রেখেছেন, সেহেতু সমগ্র জগতে আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়তম আর কেউ হতে পারবে না।(-আত্মশুদ্ধি ৮৫)

(৩) আল্লাহ প্রদত্ত্ব অসীম নেয়ামতের স্বাভাবিক চাহিদা এই যে, আমি যেন আমার জীবনে তারই আনুগত্য করি। তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো আনুগত্য যেন না করি। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি যে সকল নেয়ামত আমাকে দান করেছেন, তা যেন শুধুমাত্র ঐ সকল কাজে খরচ করি, যা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টানুযায়ী হয়ে থাকে এবং ঐ সকল কাজে খরচ করা থেকে বিরত থাকি, যা তাঁর সন্তুষ্টির খেলাফ হয়।

যখন শোকরের উপরোক্ত তিনটি উপাদান কোন ব্যক্তির মধ্যে একত্রে পাওয়া যাবে, তখন তাছাওউফের পরিভাষায় এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে শোকরের মাকাম হাসিল করেছে।

মাকামে শোকর অর্জনের উপায়

'মাকামে শোকর' এর এ মহান দৌলত কিভাবে অর্জিত হবে? ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'মাকামে শোকর' হাসিল করার পদ্ধতি হলো, আল্লাহপাকের নেয়ামত সম্পর্কে অধিক পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা করা । তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'এহইয়াউ উলূমিদ্ দ্বীনে' ঐ সকল

নেয়ামতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ শোকরের মাকাম হাসিল করতে পারে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, নেয়ামতসমূহ দুই প্রকার। (১) ঐ সকল নেয়ামত যা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে লাভ করে থাকে। যেমন, অমুক ব্যক্তি অনেক বড় আলেম। অমুক ব্যক্তি সুন্দর একটি বাড়ীর মালিক । অমুক ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যশালী সন্তান লাভ হয়েছে। অমুকে সকলের প্রিয়পাত্র। উপরোক্ত নেয়ামতসমূহ ব্যক্তির সাথে খাছ। (২) এছাড়া কিছু নেয়ামত এমন আছে, যা ব্যাপকভাবে সকল সময় সকল মানুষ লাভ করে থাকে। যেমন, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আগুন, পানি, বাতাস, পাহাড়, জঙ্গল, মাটি, মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, চক্ষু, কর্ণ, নাক, হাত, পা ইত্যাদি। মানুষ যদি এ সকল নেয়ামত ও এর হেকমত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে এটা সম্ভবই নয় যে, সে 'শোকরের মাকাম' হাসিল করতে পারবে না। কিন্তু যেহেতু এ সকল নেয়ামত না চাইতেই আল্লাহপাক দান করেছেন এবং এ সকল নেয়ামত হাসিল করার জন্য কোন প্রকার পয়সা খরচ হয়নি, পরিশ্রম করতে হয়নি, এজন্য মানুষ হয়তো এগুলোকে নেয়ামতই মনে করে না অথবা নেয়ামত মনে করলেও এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করে, সাধারণ দৃষ্টিতে এগুলো অতিক্রম করে যায়। অথচ মানুষের এভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন ছিলো যে, যদি কখনো ঐ সকল নেয়ামত হতে কোন একটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এক কোটি দুই কোটি নয়, সমগ্র দুনিয়ার সকল সম্পদ ব্যয় করেও কি তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে? না সম্ভব হবে না, পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইশারা করা হয়েছেঃ

إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليل سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ الهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِضِيَا :

অর্থাৎ, আল্লাহপাক যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর স্থায়ীভাবে রাত্রিকে চাপিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন মাবুদ আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করবেন?

(সূরা আল কাসাস ৭১) (- আত্মশুদ্ধি ৯০)

এরূপভাবে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اللَّهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ

অর্থাৎ, আল্লাহপাক যদি স্থায়ীভাবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে চাপিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন মাবুদ আর কে আছে, যে তোমাদের এমন রাত এনে দিতে পারবে, যে রাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করবে? (সূরা আল কাসাস ৭২)

আত্মশুদ্ধির পথে ৪র্থ পদক্ষেপ

মাকামে যুহদ (দুনিয়া বিমুখত)

چیست دنیا از خدا غافل شدن

অর্থাৎ, আল্লাহপাক হতে গাফেল হওয়ার নামই দুনিয়া ।

'যুহুদ' এর শাব্দিক অর্থ হলো, নিজের প্রিয় কোন জিনিসকে অন্য উত্তম জিনিসের তরে ত্যাগ করা। ইসলামী পরিভাষায় 'যুহুদ' বলা হয় আখিরাতের (কল্যাণের) জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কেবলমাত্র দুনিয়া ত্যাগ করার নাম 'যুহদ' নয়। এজন্য কোন ব্যক্তি যদি নির্বোধ হওয়ার দরুণ দুনিয়া ত্যাগ করে, তাহলে এটাকে 'যুহদ' বলা যাবে না ।

আখেরাতের কল্যাণের জন্য যে ধরনের দুনিয়া ত্যাগী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে, সেটা বুঝতেও অনেকে ভুল করে থাকে। অনেকে 'যুহদ' আর বৈরাগ্যকে এক মনে করে থাকে। তারা মনে করে যে, পানাহার করা, ব্যবসা করা, জীবিকার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা 'যুহদ' এর পরিপন্থী। অথচ এ ধরনের দুনিয়া ত্যাগী হওয়া কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট হুকুমের পরিপন্থী।

এ কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে যে, একটি জিনিষ হলো, দুনিয়ার অতি প্রয়োজনীয় কাজ-কারবার, যেগুলো বাদ দিয়ে মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব এবং যেগুলো অর্জন করা মানুষের স্বভাবের মধ্যে দাখেল; যেমন, প্রয়োজন অনুসারে পানাহার করা, জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করা, এ ধরনের জিনিসকে 'হুক্কে নফ্স' বলা হয়। শরী'অত মানুষের জন্য এ সকল হক আদায় করাকে আবশ্যকীয় করেছে। এ সকল হক ত্যাগ করাকে বৈরাগ্য বলে। কুরআনেকারীমে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীছ শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

অর্থাৎ, ইসলাম (কর্তৃক নির্ধারিত) ফরীযার পর অন্য আরেকটি ফরীযা হলো জীবিকা অন্বেষণ করা। (আস সুনানুল কুবরা ৬ঃ১২৮ ও বায়হাকী)

এজন্যই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) স্বীয় মুরীদদেরকে নিজ নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বিশেষ তাকীদ করতেন। কেননা এটা নফসের হকের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কোন কাজই করতে পারে না ।

অপর জিনিসটি হলো, 'হুযূযে নফস' অর্থাৎ, প্রবৃত্তির ঐ সকল কামনা-বাসনা, যার উপর মানুষের জীবনধারণ নির্ভরশীল নয় এবং যা হাসিল করা মানুষের স্বভাবের মধ্যে দাখেল নয়। (- আত্মশুদ্ধি ৯১)

মানুষ এ সকল জিনিস জীবনধারণের প্রয়োজনে নয়, বরং স্বীয় প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি পূরণ ও চাহিদা মিটানোর জন্য অবলম্বন করে থাকে। এ ধরনের কামনা-বাসনা ত্যাগ করাকে 'যুহুদ' বলে। এটাই ইসলামের পছন্দ ও উদ্দেশ্য । কুরআন-হাদীছ, ফিকাহ এবং সূফীয়ায়ে কেরামের বাণীতে দুনিয়া ত্যাগী হওয়া বলতে এ যুহুদকেই বুঝানো হয়েছে, বৈরাগ্যকে নয় ।

'যুহুদ' এর তিনটি স্তর

সূফীয়ায়ে কেরাম বলেছেনঃ যুহদের তিনটি স্তর।

(১) সর্বোচ্চ স্তরঃ এই যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি অন্তরে এমন বিতৃষ্ঞা ও ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া যে, যদি না চাইতেও কেউ কোন কিছু দেয়, তাহলে তাও ভাল মনে হয় না। কিন্তু এ ঘৃণা সত্ত্বেও তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে এবং মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ, অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়) 'যুহদ' এর এই সর্বোচ্চ স্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলো। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

مالي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة . ثم راح وتركها

অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমার দৃষ্টান্ততো ঐ ঘোড় সওয়ারের মতো যে সামান্য সময়ের জন্য কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, কিছুক্ষণ পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তা ছেড়ে চলে যায় ।

(তিরমিযী ২:৬৩)

এ কারণেই খানা-পিনার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিলো যে, তিনি অত্যন্ত কম খেতেন । শামায়েলে তিরমিযীর একাধিক বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট ভরে খানা খাননি । হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) ইরশাদ করেন, অনেক সময় আমরা মাসের পর মাস শুধুমাত্র খেজুর এবং পানি খেয়ে কাটিয়েছি।

(বুখারী শরীফ ২:৯৫৫, মুসলিম শরীফ ২:৪১০)

(২) দ্বিতীয় স্তরঃ 'যুহদ' এর দ্বিতীয় স্তর এই যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি প্রবল ঘৃণাবোধও থাকবে না এবং বিশেষ আকর্ষণও থাকবে না। মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত ধন-সম্পদ হস্তগত হলে আল্লাহপাকের শোকরিয়া আদায় করে তা ব্যবহার করে এবং কোন কিছু না পেলেও তেমন কষ্ট অনুভব করে না, আফসোসও করে না।

(৩) 'যুহদ' এর তৃতীয় স্তরঃ এই যে, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আছে ঠিকই কিন্তু দুনিয়া কামানোর চিন্তা বেশী করে না। এ কারণেই দুনিয়ার মোহ তাকে আল্লাহপাকের স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারে না। 'যুহদ' এর এ স্তরের অপর নাম (অল্পে তুষ্টি) এ সম্পর্কে আল্লামা রুমী (রহঃ) বলেনঃ

چيست دنيا از خدا غافل شدن
نے قماش ونقره وفرزند وزن

অর্থাৎ, (কেবলমাত্র) স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ত্রী ও পুত্রের নাম দুনিয়া নয়, দুনিয়া হলো, মানুষের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি পরিপূর্ণভাবে এ সকল জিনিসে আবদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহপাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পদ তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে না পারে, তাহলে তার এই সম্পদকে দুনিয়া বলা হবে না। (- আত্মশুদ্ধি ৯২-৯৩)

পক্ষান্তরে কারো নিকট যদি চারটি পয়সাই (অতি সামান্য সম্পদ) থাকে এবং এই চার পয়সার মধ্যে তার মন আটকে থাকে, তাহলে এটাকেই দুনিয়া বলা হবে এবং এটাই তিরস্কৃত।

আত্মশুদ্ধির পথে ৫ম পদক্ষেপ

মাকামে তাওহীদ

یکے دان یکے خوان یکے بین یکے جو

অর্থঃ আল্লাহকে একক জানো, একক পড়ো, একক দর্শন করো, একক অনুসন্ধান করো। যে সকল বাতেনী আমল মানুষের জিম্মায় আবশ্যকীয় করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো "তাওহীদ" বা একত্ববাদের স্বীকৃতি। 'তাওহীদ' এর একটি অর্থ- যা ইলমে আক্বাইদের কিভাবে পড়ানো হয়ে থাকে, যার অর্থ এই যে, আল্লাহপাককে এক বলে স্বীকার করা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। এটাকে আকীদাগত তাওহীদ বলা হয়। এর উপরই ঈমানের ভিত্তি। এই স্বীকৃতি ব্যতীত মানুষ মুসলমানই হতে পারে না। কিন্তু ইলমে

তাছাওউফে 'তাওহীদ' বলতে আমলী তাওহীদকে বুঝানো হয়, যা আক্বীদাগত তাওহীদের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। এর ব্যাখ্যা এই যে, আক্বীদাগত তাওহীদে যে বিশ্বাসটি আমলীভাবে হাসিল করা হয়েছিলো, সেই বাস্তব বিশ্বাসকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা। অর্থাৎ, সর্বক্ষণ এই হাকীকতটির প্রতি দৃষ্টি রাখা যে, এ জগতে যা কিছু হচ্ছে, তা কেবল আল্লাহপাকের একক সত্ত্বা থেকে হচ্ছে। এই দুনিয়ায় যত ঘটনা ঘটে, তা সবই আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘটে। আল্লাহপাকের ইচ্ছা ব্যতীত একটি কণাও এদিক-সেদিক নড়াচড়া করতে পারে না। বিশ্বাসগতভাবে উপরোক্ত কথাগুলোকে সকল মুসলমানই জানে এবং মানে। কিন্তু সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সকল মুহূর্তে এ হাকীকতটি অন্তরে জাগ্রত থাকে না। এ কারণে যখন কোন বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে সুখ অথবা দুখ পৌঁছে তখন সেই বাহ্যিক বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে সুধ অথবা দুঃখ পোছে, তখন সেহ বাহ্যিক উপকরণকেই সবকিছুর কারণ মনে করা হয় এবং আনন্দ অথবা বেদনা উভয়ের সম্পর্ক ঐ উপকরণের দিকে করা হয়। কিন্তু আমলী তাওহীদের দাবী হলো, ঐ হাকীকতকে সর্বক্ষণ অন্তরে এভাবে জাগ্রত রাখা, যেন তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ কথাটিকে কোন বুযুর্গ এভাবে বলেছেনঃ

توحید خدا واحد دیدن بود، نه واحد گفتن

অর্থাৎ, অন্তরে আল্লাহপাকের একত্ববাদের দর্শন ও স্বীকৃতিকে তাওহীদ বলে,
কেবল মুখে একক বলাকে নয় । মানুষ যখন জগতের সকল ঘটনার পিছে সর্বক্ষণ এক আল্লাহকে দেখে, তখন সে অন্য মানুষের দোস্তী ও দুশমনীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা সে ভাল মতোই জানে যে, সুখ অথবা দুঃখ যা কিছুই আসছে সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে। (- আত্মশুদ্ধি ৯৭-৯৮) বাহ্যিকভাবে যে লোকটিকে এর কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সে শুধুমাত্র এ ঘটনার মাধ্যম বৈ নয়।

از خدا دان خلاف دشمن و دوست
که دل هر دو در تصرف اوست

অর্থাৎ, শত্রুর শত্রুতা এবং বন্ধুর বন্ধুত্ব সবই আল্লাহর পক্ষ হতে কেননা মানুষের অন্তর সর্বক্ষণ আল্লাহপাকের নিয়ন্ত্রণে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর রুচী বিরুদ্ধ, অপছন্দনীয় কোন কিছু ঘটতো, তখন তিনি অতিরিক্ত ক্রোধ প্রকাশের পরিবর্তে শুধু এতটুকু বলতেন যে,

ماشاء الله كان وما لم يشأ لا يكون

অর্থাৎ, আল্লাহপাক যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। আর যা তিনি চাইবেন না, তা হবে না।

বাস্তব কথা এটাই যে, দুঃখ এবং বেদনার মুহূর্তে আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যবস্থা হতে পারে না ।(- আত্মশুদ্ধি ৯৮)

আত্মশুদ্ধির পথে ৬ষ্ঠ পদক্ষেপ

মাকামে তাওয়াক্কুল

بر توکل پایه اشتربه بند

অর্থাৎ, উটের পা বেঁধে তাওয়াক্কুল করো।

যে সকল বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আমল করা ফরয, তার মধ্য হতে একটি হলো, 'তাওয়াক্কুল'। প্রকৃতপক্ষে 'তাওহীদ' এর মাকাম হাসিল করার পরই কোন ব্যক্তি 'তাওয়াক্কুল' এর মাকাম হাসিল করতে পারে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে বার বার তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব, ফযীলত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (তাওয়াক্কুল) একটি আরবী শব্দ এর শাব্দিক অর্থ হলো, কারো প্রতি ভরসা করে কোন কাজ তার উপর অর্পণ করা। ইসলামী পরিভাষায় 'তাওয়াক্কুল' বলা হয়, দুনিয়াবী আসবাব-পত্র ও উপায়-উপকরণের উপর ভরসা না করে, আল্লাহপাকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে, নিজের সকল কাজ-কর্ম তাঁর নিকট সঁপে দেওয়া। (- আত্মশুদ্ধি ১০৪)

তাওয়াক্কুল তিন প্রকার

যেহেতু তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে লোকেরা সাধারণতঃ ভুল করে থাকে, সেহেতু প্রথমে জানা দরকার যে, তাওয়াক্কুল তিন প্রকার ।

(১) তাওয়াক্কুলের একটি পদ্ধতি হলো, চিন্তা ও আদর্শগতভাবে নিজের সকল ব্যাপার আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দেওয়া। কিন্তু কার্যত তার দৃষ্টি উপায়-উপকরণের প্রতি আবদ্ধ থাকে এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি তার আত্মিক মনোযোগ থাকে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, আপনি আপনার মামলা-মোকাদ্দমা কোন একজন উকিলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন এবং তার উপর আপনার ভরসাও হয়, কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা উকিলের দায়িত্বে দিয়ে একেবারে দায়িত্ব মুক্ত ও নিশ্চিত হতে পারেন না। বরং সর্বদা আপনার লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টা উকিলের সাথে লেগে থাকে।

(২) তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, আপনি বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে কেবলমাত্র আল্লাহপাকের হুকুম পালনার্থে ব্যবহার করে থাকেন। অতঃপর সর্বক্ষণ এ ধারণা জাগ্রত রাখেন যে, এ সকল বাহ্যিক আসবাব-পত্রের কোন হাকীকত নেই। কর্ম সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহপাক। তাই সকল কিছু আল্লাহপাকের নিকট সঁপে দিচ্ছি। এজন্য আপনার অধিক মনোযোগ আল্লাহর স্মরণে এবং তাঁর নিকট নিজ প্রয়োজন বর্ণনা করার দিকে থাকে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন শিশুর যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন সে তার মাকেই ডাকে। নিজে নিজে সামান্য যে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে এতে সে নিশ্চিত হয় না। তার মনোযোগ এদিকেই থাকে যে, কিভাবে মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। মা-ই তার সকল কষ্ট দূর করে দিবে।

(৩) তাওয়াক্কুলের তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, আল্লাহপাকের প্রতি এত উচ্চ পর্যায়ের ভরসা করা যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি কোন দৃষ্টি করা হয় না। এমনকি (সাহায্যের জন্য) আল্লাহকে ডাকেও না । বরং সে মনে করে আল্লাহপাকতো স্বয়ং আমার দুঃখ-বেদনা দেখছেন । তিনি নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, নমরুদ যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাযির হয়ে বললেনঃ যদি কোন খেদমতের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি হাজির আছি। এর উত্তরে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) বললেন

اما اليك فلا، وأما الله فهو يعلم مابي

অর্থাৎ, আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য আমি আল্লাহর মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি আমার অবস্থা নিজেই জানেন ।

তাওয়াক্কুলের উপরোক্ত তিন প্রকার হতে প্রথম প্রকার সাধারণ মানুষের তাওয়াক্কুল, যা একেবারে নিম্ন স্তরের তাওয়াক্কুল। তৃতীয় প্রকারটি তাওয়াক্কুলের হাকীকতের দিক দিয়ে অনেক উচ্চ স্তরের। কিন্তু এটা আম্বীয়াদের (আঃ) এবং উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গদের বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। স্থায়ীভাবে কর্মপন্থা বানানোর জন্য এটা শরী'আতে উদ্দেশ্য নয় । শরী অতে উদ্দেশ্য হলো, তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় প্রকার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকেই সুন্নাত বলেছেন। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে সাধারণভাবে অবলম্বন করবে, (সাথে সাথে) আল্লাহপাকের নিকট দু'আও করবে। কিন্তু ভরসা ঐ বাহ্যিক আসবাবপত্রের পরিবর্তে আল্লাহপাকের উপরই রাখবে। (- আত্মশুদ্ধি ১০৬, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

সারাংশ ও উপসংহার

আত্মা বা রুহ কী, এর পবিত্রতা কী এবং কেন এ বিষয় নিয়ে এই থিসিসে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মার বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এবং তার প্রতিকারের পথ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আত্মা পবিত্র না হলে সকল আমলই আল্লাহ তায়ালার কাছে মূল্যহীন। সর্বপ্রকার মুজাহাদা, (সাধনা) যিকির-আযকার, চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য আল্লাহপাকের বিধানের (করণীয় ও বর্জনীয়) উপর আমল করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ নিঃসঙ্কোচে করার অভ্যাস গড়া। যাতে আল্লাহর হক, নিজের নসের হক, বান্দার হক শরী'অতের হুকুম মুতাবিক পূর্ণরূপে সহজে আদায় করা যায়। কারণ এর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতে হায়াতে তাইয়্যেবা (পবিত্র জীবন) লাভের উপায় নিহিত আছে ।

বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাতা-পিতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক এবং মুসলমানদের হক আদায় করার জন্য শরী'আত কর্তৃক আমরা আদিষ্ট। কাজেই একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের হক কোন প্রকার প্রতিদান পাওয়ার লোভ না করে, অত্যন্ত উদারতা ও নম্রতার সাথে আদায় করবে এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।(- আত্মশুদ্ধি ১৩৯, মুফতি মুহাম্মদ শফী)

সেই সামান্য কথা যা তাছাওউফের সারাংশ তা এই যে, যদি কোন ইবাদত করতে অলসতা অনুভূত হয়, তাহলে অলসতার মুকাবেলা করে সেই ইবাদত করতে থাকা। আর যদি কোন গোনাহের আগ্রহ হয়, তাহলে সেই আগ্রহের মুকাবেলা করে ঐ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যে ব্যাক্তি এ দু'টি কাজ করতে সক্ষম তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কারণ এটাই আল্লাহপাকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার উপায়। এটাই তাকে পাপ থেকে রক্ষা করে আল্লাহর পথে অগ্রসর করে দিবে। [হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ)]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আত্মার পবিত্রতা অর্জনের তাওফিক দান করুণ।
আমিন।